BanglaBook.org

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

চাঁদের অমাবস্যা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

চাঁদের অমাবস্যা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এই উপন্যাসটির বেশির ভাগ ফ্রান্সের আলপ্‌স্ পর্বত অঞ্চলে পাইন-ফার-এলম গাছ পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে লেখা হয়। মঁসিয় পিয়ের তিবো এবং মাদাম ঈভন তিবোকে তাঁদের সহৃদয় আতিথ্যের জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। চোখটা খোলা মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই।

কিন্তু কখন সে মৃতদেহটি প্রথম দেখে? এক-ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা আগে? হয়তো ইতিমধ্যে এক প্রহর কেটে গেছে, কিন্তু যুবক শিক্ষক সে কথা বলতে পারবে না। মনে আছে সে বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চতুর্দিকে ঝলমলে জ্যোৎস্নালোক, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো। তখন সে দৌড়তে শুরু করে নাই। বাঁশঝাড়ের সামনেই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে সে তাকে দেখতে পায়। ধীরপদে হেঁটেই যেন সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, নিরাকার বর্ণহীন মানুষ। হয়তো তার দিকে কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে ছিলও। তারপর সে দৌড়তে শুরু করে।

তখন থেকে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি করছে। হয়তো এক প্রহর হল ছুটাছুটি করছে। চরকির মতো, লেজে কেরোসিনের টিন বেঁধে দিলে কুকুর যেমন ঘোরে তেমনি। কেন তা সে বলতে পারবে না। কেবল একটা দুর্বোধ্য নির্দয় তাড়না বোধ করে বলে দিশেহারা হয়ে অবিশ্রান্তভাবে মাঠে-ঘাটে ছুটাছুটি করে, অফুরন্ত জ্যোৎস্নালোকে কোথাও গা-ঢাকা দেবার স্থান পায় না, আবার ছায়াচ্ছন্ন স্থানে নিরাপদও বোধ করে না। গভীর রাতে এমন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পশ্চাদ্ধাবিত অসহায় পশুর মতো সে জীবনে কখনো ছুটাছুটি করে নাই। অবশ্য গ্রামবাসী অনভিজ্ঞ যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহও কখনো দেখে নাই।

তারপর একটি অদ্ভুত কারণেই সে হঠাৎ থেমে একটা আইলের পাশে উবু হয়ে বসে নিঃশব্দ রাতে সশব্দে হাঁপাতে থাকে। ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরি দেখে, যার শিং-দাঁত-চোখ কিছুই নাই। হয়তো মনে হয় রাত্রি গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে, চোখ-ধাঁধানো অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে জীবনের আভাস দেখা দিয়েছে। হঠাৎ আশ্রয় লাভের আশায় তার চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে।

অবশেষে মাঠ-ঘাট কুয়াশায় ঢেকে যায়, ওপরে চাঁদের গোলাকার অস্তিত্বের অবসান ঘটে। কুয়াশায় আবৃত হয়ে যুবক শিক্ষক গুটি মেরে বসে থাকে। হাঁপানি তখন কিছু কমেছে, সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ভয়টাও যেন পড়েছে কিছু। যেখানে বসেছিল সেখানে বসেই কেবল লুঙ্গি

তুলে সরলচিত্তে লাঙ্গল–দেয়া মাঠে সে প্রস্রাব করে। মনে হয় মাথাটা যেন সাফ হয়ে আসছে। বুক থেকে ভারি কিছু নাবতে শুরু করেছে দেখে সহসা মুক্তির ভাব এলে সে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, মনে হয় সে কাঁদবে। কিন্তু সে কাঁদে না। চারধারে গভীর নীরবতা। সে নিশ্চল হয়ে মাথা গুঁজে বসে যেন কারো অপেক্ষা করে।

শ্লথগতি হলেও কুয়াশা সদাচঞ্চল। নড়ে–চড়ে, ঘন হয়, হাল্কা হয়। সুতরাং এক সময়ে হঠাৎ চমকে উঠে উপরের দিকে তাকালে যুবক শিক্ষকের শীর্ণ মুখে এক ঝলক রূপালি আলো পড়ে। স্বচ্ছ–পরিষ্কার আকাশে কুয়াশামুক্ত চাঁদ আবার ঝলমল করে। স্নিগ্ধ প্রশান্ত চাঁদের মুখ দেখে অকারণে সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে আবার ছুটতে শুরু করে। ওপরে চাঁদ হেলে–দোলে, হয়তো হাসেও। নির্দয় চাঁদের চোখ মস্ত। যুবক শিক্ষক প্রাণভয়ে ছোটে। যত ছোটে, ততই তার ভয় বাড়ে। সামনে কিছু নাই, তবু দেখে লোকটি দাঁড়িয়ে। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকতে শুরু করে। তার মনে হয় একটি হিংস্র কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। তারপর সে দেখে, বাঁশঝাড়ের সে মৃতদেহটি তার পথ বন্ধ করে লাঙ্গল–দেয়া মাটিতে বাঁকা হয়ে শুয়ে আছে। অর্ধ–উলঙ্গ দেহে প্রাণ নাই তবু একেবারে নিশ্চল নয়। কোথায় যাবে যুবক শিক্ষক? তার হিমশীতল শরীর নিশ্চল, শীর্ণমুখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

আবার যখন সে দৌড়তে শুরু করে তখন কিছু দূরে গিয়ে মাটির দলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মুখ থেকে একটা ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বের হয়। তারপর মাটিতে মুখ গুঁজে সে নিস্তেজভাবে পড়ে থাকে। শীঘ্র তার পিঠ শিরশির করে ওঠে। পিঠে সাপ চড়েছে যেন। বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়, অবাধে ঘাম ছোটে। সে বুঝতে পারে লোকটি দাঁড়িয়ে তারই পিঠের উপর। মুখ না তুলেই দেখতে পায় তাকে : বিশালকায় দেহ, তার ছায়াও বিশালাকার। যুবক শিক্ষক এবার নিতান্ত নিঃসহায় বোধ করতে শুরু করে। জীবনের শেষ মুহূর্তে দেহ গলে যায়, সর্বশক্তির অবসান ঘটে। আর কিছু করবার নাই বলে সে অপেক্ষা করে। সময় কাটে। আরো সময় কাটে, কিন্তু কিছুই ঘটে না। অবশেষে এক সময়ে পিঠ থেকে সাপ নাবে, বিশালাকার ছায়াও সরে যায় এবং যুবক শিক্ষকের নাকে মাটির গন্ধ লাগে। মাথা তুলে সে ধীরে–ধীরে এধার–ওধার তাকায়, বাঁ–দিকে, ডান–দিকে। কুয়াশা নাই। জ্যোৎস্না–উদ্ভাসিত ধবধবে মাঠে কেউ নাই। দূরে একটা কুকুর বেদনার্তকণ্ঠে আর্তনাদ করে। তাছাড়া চারধার নিঃশব্দ। একচোখা চাঁদ সহস্র চোখে জনশূন্য পথপ্রান্তর পর্যবেক্ষণ করে। চাঁদ নয়, যেন সূর্য।

হাঁটুতে ভর করে যুবক শিক্ষক উঠে বসে, মুখ বিষাদাচ্ছন্ন। আলোয়ান দিয়ে মুখের ঘাম মোছে, চোখের উদ্‌ভ্রান্তি কাটে। কেবল থেকে–থেকে নিচের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপে। অনেকক্ষণ সে বসে থাকে নতমুখে। আবার যখন সে মুখ তোলে তখন কুয়াশার পুনরাগমন হয়েছে। সে–কুয়াশা ভেদ করে কেমন অহেতুক, উদ্দেশ্যহীনভাবে সে তাকাবার চেষ্টা করে। চোখে এখন নিস্তেজ ভাব, মনের ভয়টাও যেন দূর হয়েছে। তারপর আবার সে তাকে দেখতে পায়। একটু দূরে বটগাছ, আবছা–আবছা চোখে পড়ে। শিকড়ে–শিকড়ে দৃঢ়বদ্ধ গাছটি অস্পষ্ট আলোয় ভাসে, যেন পানিতে আমজ্জ হয়ে আছে গাছটি। যুবক শিক্ষক বারকয়েক মাথা নাড়ে। বটগাছের পাশেই ছায়ার মতো সে দাঁড়িয়ে। জট নয় শাখা নয়, সে–ই দাঁড়িয়ে। এখন আবছা দেখালেও সে আর নিরাকার বর্ণহীন মানুষ নয়।

আবার কী ভেবে যুবক শিক্ষক মাথা নাড়ে। তার মনে গভীর অবসাদ, কিন্তু আর ভয় নেই যেন। যে–মানুষ নিদারুণ ভয়ে বিকৃতমস্তিষ্কের মতো দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এতক্ষণ ছুটাছুটি করেছিল, সে–মানুষ এখন ভয়মুক্ত। বটগাছের পাশে ছায়াটিকে তার আর ভয় নাই।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘরাভিমুখে হাঁটতে শুরু করে। সবুজ আলোয়ানে আবৃত তার শীর্ণ শরীর দীর্ঘ মনে হয়, পদক্ষেপে অসীম দুর্বলতার আভাস দেখা গেলেও তাতে সঙ্কোচ–দ্বিধা নাই। তার অনভিজ্ঞ মনে নিদারুণ আঘাতের ফলে যে–প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে–বিক্ষুব্ধতা বিদূরিত হয়েছে।

BanglaBook.org

কোনোদিকে না তাকিয়েই সে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে। সে আর ভাবে না। ভাবতে চেষ্টা করলেও তার ভাবনা ধরবার কিছু পায় না। বৃহৎ গহ্বরে ধরবার কিছু নাই।

ঘরে ফিরে পাথরের মতো প্রাণহীন শরীরের উপর কাঁথা টেনে সে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকে। গভীর রাতে কোথাও কোনো শব্দ নাই। শব্দ হলেও তা তার কানে পৌঁছায় না। অন্ধকারের মধ্যে তার দৃষ্টি খুলে থাকলেও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণতম শব্দও পাওয়া যায় না। তাছাড়া মনে হয়, সে যেন কারো অপেক্ষা করে।

কীভাবে রাত্রির অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি শুরু হয়?

তখন বেশ রাত হয়েছে। শারীরিক প্রয়োজনে ঘুম ভাঙলে যুবক শিক্ষক আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। শীতের গভীর রাত, কেউ কোথাও নাই। ঘরের পেছনে জামগাছ। তারই তলে শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে সে ঘরে ফিরবে কিন্তু আলোয়ানটা ভালো করে জড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন চোখের ঘুমটা কেটে গেছে। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ছায়া, কিন্তু চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার অপরূপ লীলাখেলা।

তখনো কাদের বড়বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে নাই। অন্য এক কারণে যুবক শিক্ষক জামগাছের তলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সে-কারণটি হয়তো নেহাতই বালসুলভ। কিন্তু শিক্ষকতা করে বলে তার বাহ্যিক আচরণ-ব্যবহার বয়স্থব্যক্তির মতো হলেও তার মনের তরুণতা এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। বরঞ্চ স্বল্পভাষী যুবক শিক্ষকের মনের অন্তরালে নানারকম স্বপ্ন-বিশ্বাস এখনো জীবিত। সুযোগ-সুবিধা পেলে তার পক্ষে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য নয়। তবে এ-সব সে গোপনই রাখে। তাছাড়া, মনের কথা ঠাট্টা করেও বলবে এমন কোনো লোক সে চেনে না।

জামগাছের তলে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতের প্রতি তার অদমনীয় আকর্ষণ। শুধু তার রূপেই যে সে মোহিত হয়, তা নয়। তার ধারণা, চন্দ্রালোকে যে-অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ পায় তা উদ্দেশ্যহীন নয়, মূক মনে হলেও মূক নয়। হয়তো সে-সময়ে, যখন মানুষ-পশুপক্ষী নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে। সে-কথালাপের মর্মার্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে হয়তো অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবণাতীত নয় : কান পেতে শুনলে তা শোনা যায়। বালকবয়সে পরপর তিন বছর লায়লাতুলকদরের রাতে যুবক শিক্ষক সমস্ত রাত জেগেছিল এই আশায় যে, গাছপালাকে ছেজ্‌দা দিতে দেখবে। গাছপালার এমন ভক্তিমূলক আচরণে আজ তার বিশ্বাস নাই, কিন্তু রাত্রি জাগরণের ফলে তার মনে যে-নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় সে-ধারণা এখনো সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। এত সৌন্দর্য কি আদ্যোপান্ত অর্থহীন হতে পারে? এমন বিস্ময়কর রূপব্যঞ্জনার পশ্চাতে মহারহস্যের কিছুই কি ইঙ্গিত নাই? তাতে মানুষের মনে যে-ভাবের উদয় হয়, সে-ভাব কি সৃষ্টির মহানদীর তরঙ্গশীকরজাত নয়? মনঃপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশব্দ করে শুনলেই নিঃসন্দেহে অশ্রোতব্য শ্রোতব্য হবে।

চন্দ্রালোকের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক হয়তো বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ নির্জন রাতে চলনশীল কিছু দেখতে পেলে প্রথমে সে চমকে ওঠে। তারপর সে তাকে দেখতে পায়। বড়বাড়ির কাদেরকে চিনতে পারলে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত এ-মায়াময় রাতে কাদেরের আকস্মিক আবির্ভাব তার কাছে হয়তো অজাগতিক এবং রহস্যময়ও মনে হয়। এত রাতে এমন দ্রুতগতিতে কোথায় যাচ্ছে সে?

তখন যুবক শিক্ষকের চোখ জ্যোৎস্নায় জলসে গেছে, তাতে ঘুমের নেশা পর্যন্ত নাই। দ্রুতগামী কাদেরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটি ঝোঁক চাপে তার মাথায়। সে ঠিক করে, তাকে অনুসরণ করবে।

মনে মনে ভাবে, দেখি কোথায় যায় কাদের। বড়বাড়ির দাদা সাহেব বলেন, কাদের দরবেশ। দেখি রাতবিরাতে কোথায় যায় দরবেশ।

তখন কাদের বেশ দূরে চলে গেছে। জামগাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে যুবক শিক্ষক তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কাউকে অনুসরণ করা সহজ নয়। যুবক শিক্ষককে দূরে-দূরে গা-ঢাকা দিয়ে চলতে হয়। ধরা পড়বার ভয় ছাড়া একটা লজ্জাবোধও তার চলায় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে শীঘ্র দ্রুতগামী কাদেরকে সে হারিয়ে ফেলে। খাদেম মিঞার ক্ষেত পার হয়ে গাঁয়ে আবার প্রবেশ করে দেখে, কোথাও কাদেরের কোনো চিহ্ন নাই। একটু পরে চৌমাথার মতো স্থানে এসে সে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। কোন দিকে যাবে? চারপথের একটি যায় নদীর দিকে, আরেকটি গ্রামের ভেতরে। তৃতীয় পথ সদ্যতৈরি মসজিদের পাশ দিয়ে গিয়ে বাইরে সরকারি রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়। শেষটা যায় তারই ইস্কুল পর্যন্ত। যুবক শিক্ষক পথনির্দেশ পাবার আশায় কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো পদধ্বনি শুনতে পায় না। কাদের যেন চন্দ্রালোকে এক মুঠো ধুঁয়ার মতো মিলিয়ে গেছে।

চৌমাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে স্থির করে, ঘরে ফিরে যাবে। ভাবে, লোকটা যে কাদেরই সে-কথা সঠিকভাবে সে বলতে পারে না, চোখের ভুল হয়ে থাকতে পারে। তাকে মুখামুখি দেখে নাই, কেবল তার পেছনটাই দেখেছে। ভুল হতে পারে বৈকি।

কিন্তু যুবক শিক্ষক ফিরে যায় না। কাদেরকে সে সামনাসামনি দেখে নাই বটে কিন্তু তার হাঁটার বিশেষ ভঙ্গি, ঘাড়ের কেমন উঁচু-নিচু ভাব, মাথার গঠন ইত্যাদি দেখেছে। ভুল অবশ্য হতে পারে, কিন্তু আরেকটু দেখে গেলে ক্ষতি কী? মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেলে তার সম্বন্ধে কৌতূহলটা আরো বাড়ে যেন। কিন্তু কোন দিকে যাবে? চারটা পথের কোনটা ধরবে? কাদেরের রাত্রিভ্রমণের উদ্দেশ্য যখন সে জানে না তখন কোনো একটি পথ ধরার বিশেষ কারণ নাই। তাই অনির্দিষ্টভাবে চারটি পথের একটি পছন্দ করে সে আবার হাঁটতে শুরু করে। কিছুক্ষণ সে কান খাড়া করে রাখে, ঘন-ঘন তাকায় এধার-ওধার। কিন্তু তার সন্ধানকার্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শীঘ্র সে ভুলে যায় তার চলার উদ্দেশ্য। তার ঘরের পেছনে যে-অপরূপ চন্দ্রালোক তাকে বিমুগ্ধ করেছিল, সে-চন্দ্রালোক এখনো মাঠে-ঘাটে গাছপালা-ঝোপঝাড়ে মানুষের বাসগৃহে মোহ বিস্তার করে আছে। পরিচিত দুনিয়ায় অজানা জগতের মায়াময় স্পর্শ। চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত গভীর রাতে যুবক শিক্ষক একাকী ঘুরে বেড়ায় নাই অনেকদিন। কাদেরের কথা তার মনে থাকলেও তাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন সে আর বোধ করে না।

তারপর একসময়ে একটি গৃহস্থবাড়ির কাছে দেখে, পোঁতা খুঁটির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে কাদের। তার দেহে সহসা কেমন চঞ্চলতা আসে। মনে হয় সে হাসছে। তারই দিকে তাকিয়ে সে হাসছে এবং গা-ঢাকা দেবার কোনোই চেষ্টা নাই।

হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা হলে যুবক শিক্ষক সজোরে বলে ওঠে,

'কী ব্যাপার?'

কোনো উত্তর দেয় না।

তারপর কেমন সন্দেহ হলে এগিয়ে দেখে, ভিটেবাড়ির পাশে মূর্তিটি কলাপাতা মাত্র, চাঁদের আলোয় মানুষের রূপ ধারণ করেছে। চাঁদের আলো যাদুকরী, মোহিনী।

যুবক শিক্ষকের বুক সামান্য কাঁপতে শুরু করেছিল। এবার কিছুক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে স্থির করে ঘরে ফিরে যাবে। মুখে তখনো লজ্জার ঝাঁঝ। সে ঘরাভিমুখে রওনা হয়। তবে সোজাপথ না ধরে একটু বাঁকাপথ ধরে। সোজাপথ ধরলে অসাধারণ দৃশ্যটি তাকে দেখতে হত না।

গ্রামের ভেতরের পথটা এড়িয়ে সে নদীর দিকে চলতে শুরু করে। কাদেরকে সে আর অনুসরণ করছে না, সে-বিশ্বাসে তার কথা ভুলতে তার দেরি হয় না। তাকে কলাগাছে রূপান্তরিত করে সে আবার চন্দ্রালোকে-উদ্ভাসিত বিস্ময়কর জগতের নেশায় আত্মভোলা হয়ে

BanglaBook.org

উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে থাকে : পদক্ষেপে কোনো তাড়া নাই, তার শীর্ণমুখ আবেশাচ্ছন্ন।

গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে একটু বাদাড়-ঝোপঝাড় পাঁচমেশালী গাছপালা, একটা প্রশস্ত বাঁশবন। তারপর ঢালা ক্ষেত। শস্যকাটা শেষ, স্থানে-স্থানে লাঙ্গল দেয়া হয়েছে।

সে-জঙ্গলের পাশে পৌঁছে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক একটু দাঁড়িয়েছে, এমন সময় একটা আওয়াজ তার কানে পৌঁছায়। আওয়াজটা যেন বাঁশবন থেকে আসে। সেখানে কে যেন চাপা ভারিকণ্ঠে কথা বলছে।

আশপাশে বাসাবাড়ি নাই। অকারণে যুবক শিক্ষক এধার-ওধার তাকায়, এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয় নদীর বুক থেকে জেলেদের কণ্ঠস্বরই শুনতে পাচ্ছে সে। কিন্তু অবশেষে তার সন্দেহ থাকে না, বাঁশঝাড়ের মধ্যেই কেউ কথা বলছে। শ্রোতা থাকলেও তার গলার আওয়াজ শোনা যায় না : বক্তার শ্রোতা যেন বাঁশঝাড়ই। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সে-কণ্ঠ অশরীরী মনে হয় যুবক শিক্ষকের কাছে। তারপর কাদেরের কথা তার স্মরণ হয়।

এবার অদম্য কৌতূহল হলে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায়। অল্পক্ষণের জন্যে কণ্ঠস্বর থামে বলে সে সামান্য নিরাশ বোধ করে। শীঘ্র কণ্ঠস্বরটি সে আবার শুনতে পায়। ঈষৎ হেসে এবার সে সজোরে বলে ওঠে, "কাদের মিঞা! বাঁশঝাড়ে কাদের মিঞা!"

কথাটা সজোরে বলেছে কি বলে নাই, অবশ্য সে-বিষয়ে এখন সে হলফ করে কিছু বলতে পারে না। নিঃশব্দ গভীর রাতে এ-সব ব্যাপারে কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে? তখন মনে-বলা কথাই সশব্দে বলা কথার মতো শোনায়। কিন্তু বাঁশবনের আকস্মিক নীরবতার কারণ শুধু তা নয়। কাদেরের কথা শোনবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে যুবক শিক্ষক আবার যখন এগিয়ে যায়, তখন একরাশ শুকনো পাতায় তার পা পড়লে নীরবতার মধ্যে সহসা অকথ্য আওয়াজ হয়। সে-আওয়াজে চমকে উঠে সে নিজেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয় কাটলে কান পেতে শোনে, কিন্তু বাঁশঝাড়ের নীরবতা এবার অখণ্ডিত থাকে।

সে-নীরবতার মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যুবক শিক্ষক ভাবে, হয়তো সবটাই মনের খেয়াল। একবার হেসে মনে মনে বলে, কলাপাতা যদি মানুষ হতে পারে, বাঁশঝাড়ের সঙ্গীত মানুষের কণ্ঠ হতে পারে না কেন?

তবে কথাটা নিজেরই কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। হাওয়া ছাড়া বাঁশবনে সঙ্গীত কী করে জাগে?

কিছুটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হয়তো মনে ভয় এলে হঠাৎ সে অকারণে হাততালি দিয়ে রাখালের মতো গরু-ডাকা আওয়াজ করে ওঠে। পরক্ষণেই বাঁশবনে একটা আওয়াজ জাগে : সেখান থেকে তার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি আসে যেন। না, আওয়াজটা অন্য ধরনের। একটি মেয়েমানুষ যেন সভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

আওয়াজটা কিন্তু জেগে উঠেই আবার নীরব হয়ে যায়। কেউ যেন তা পাথর-চাপা দেয়। সাপের মুখগহ্বরে ঢুকে ব্যাঙের আওয়াজ যেন হঠাৎ থামে, বা মস্তক দেহচ্যুত হলে মুখের আওয়াজ যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়। দেহচ্যুত মাথা এখনো হয়তো আর্তনাদ করছে কিন্তু তাতে আর শব্দ নাই। চারধারে আবার অখণ্ড নীরবতা।

রুদ্ধনিশ্বাসে যুবক শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকে, দৃষ্টি নিশ্চল-নিঃশব্দ বাঁশঝাড়ের উপর নিবদ্ধ। তারপর তার বুক কাঁপতে শুরু করে, ক্রমশ হাতে-পায়ে সারা শরীরেও কাঁপন ধরে। অবশেষে পায়ের তলে মাটি কাঁপতে শুরু করে, জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত আকাশও স্থির থাকে না। শুধু বাঁশঝাড় নিশ্চল, নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পর পৃথিবীব্যাপী কম্পন থামলে ডুবতে-ডুবতে বেঁচে-যাওয়া মানুষের মতো ঝোড়ো-বেগে নিশ্বাস নেয় যুবক শিক্ষক। তারপর হয়তো সাহসের জন্যে উপরের দিকে তাকায় কিন্তু চাঁদের মায়াময় হাস্যমুখ দেখতে পায় না। সে কিছুই বুঝতে পারে না বলে অবশ

BanglaBook.org

দেহে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

অবশেষে যুবক শিক্ষকের মনে ভয় কাটে। এবার সে নির্ভয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখে। না, জ্যোৎস্নারাতে কোনো তারতম্য ঘটে নাই। স্বচ্ছ আকাশে নীলাভা, চাঁদ তাতে রানীসম। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ঝকঝক করে। অপরিসীম তৃপ্তির সঙ্গে সে ভাবে, না, জ্যোৎস্নারাতের যাদুমন্ত্রের শেষ নাই। চাঁদ মোহিনীময়। আওয়াজটি কানেরই ভুল হবে। এমন ঝকঝকে চন্দ্রালোকিত রাতে কিছুই বিশ্বাস হয় না। যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে পরিষ্কার গলায় ডাকে, 'কে?' অবশ্য কোনো উত্তর আসে না। হাওয়ায় বাঁশঝাড়ে সঙ্গীতের ঝঙ্কার জাগে, কিন্তু মানুষের কণ্ঠ জাগে না। শীতের জমজমাট রাতে একটু স্পন্দনও নাই।

এক মুহূর্ত আগে যা সত্য মনে হয়েছিল, তা যে সত্যই সে-কথা কে বলতে পারে? সত্য চোখ-কানের ভুল হতে পারে, সত্য আবার চোখে-কানে ধরা না-ও দিতে পারে। এবার নির্ভয়ে এবং কিছুটা কৌতূহলশূন্যভাবে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয় সেখানে আবার একটু আওয়াজ হয়, অস্পষ্ট পদধ্বনির মতো : কে যেন সেখান থেকে সরে যাচ্ছে। কিসের আওয়াজ? সঠিক করে বলা শক্ত। সামান্য হাওয়ায় বাঁশবনে শব্দ হয়। কিন্তু হাওয়া নাই। তাহলে জন্তু-জানোয়ারই হবে। শেয়াল কিংবা মাঠালী ইঁদুর। জঙ্গলে সর্বত্র শুষ্ক পাতা ছড়িয়ে আছে। একটুতেই শব্দ হয়। নির্ভয়ে যুবক শিক্ষক এগিয়ে যায়। অনভিজ্ঞ সরলচিত্ত যুবকের মনের আকাশে কোনো বিপদাশঙ্কার আভাস নাই, ভয়-দ্বিধা নাই। উপরে, স্বচ্ছ আকাশে সুন্দর উজ্জ্বল মায়াময়ী চাঁদ নির্ভয়ে একাকী বিরাজ করে। একটু ঝুঁকে সে একটা পড়ন্ত শাখা তুলে নেয়। তার তরুণ মুখে একটু কৃত্রিম আশঙ্কা, কৌতুকে মেশানো আশঙ্কা। ভাবে, সাপখোপও হতে পারে, এমন দুঃশীল সাপ যে দারুণ শীতেও গর্তে আশ্রয় নেয় নাই। হাতে গাছের শাখাটি শক্ত করে ধরে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়, সাপ না হোক অন্ততপক্ষে দুষ্ট ছাত্রকে শাসন করতে যায় যেন।

জন্তু-জানোয়ার নয়, সাপখোপ বা মাঠালী ইঁদুর নয়, কোনো পলাতক দুষ্ট ছাত্রও নয়। বাঁশঝাড়ের মধ্যে আলো-আঁধার। সে আলো-আঁধারের মধ্যে একটি যুবতী নারীর মৃতদেহ। অর্ধ-উলঙ্গ দেহ, পায়ের কাছে এক ঝলক চাঁদের আলো।

গভীর রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আলুথালু বেশে মৃতের মতো পড়ে থাকলেই মানুষ মৃত হয় না। জীবন্ত মানুষের পক্ষে অন্যের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হওয়াও সহজ নয়। যুবক শিক্ষক কয়েক মুহূর্ত মৃত নারীর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর একটা বেগময় আওয়াজ বুকের অসহনীয় চাপে আরো বেগময় হয়ে অবশেষে নীরবতা বিদীর্ণ করে নিষ্ক্রান্ত হয়। হয়তো সে প্রশ্ন করে কিছু, হয়তো কেবল একটা দুর্বোধ্য আওয়াজই করে : তার স্মরণ নাই। তবে এ-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ যে সে কোনো উত্তর পায় নাই। মৃত মানুষ উত্তর দেয় না।

যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড় থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন তার দৃষ্টিতে ইতিমধ্যে বিভ্রান্তির ছাপ দেখা দিয়েছে, শরীরেও কাঁপন ধরেছে। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে সে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে সচকিত হয়ে দেখে, দক্ষিণে কাদের। সে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। দেহ নিশ্চল, মুখে চাঁদের আলো। তাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সে স্বস্তিই বোধ করে। কাছে গিয়ে সে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিছু একটা বলবেও মনে হয়। কাদের পূর্ববৎ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে চাঁদের আলো তবু তার চোখ দেখা যায় না।

তারপর হঠাৎ যুবক শিক্ষকের মাথায় বিপুলবেগে একটা অন্ধ ঝড় ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে বুঝতে পারে না কী করবে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করে। তার সমস্ত চিন্তাধারা যেন হঠাৎ বিচিত্র গোলকধাঁধায় ঢুকেছে এবং সে-গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে দৌড়তে শুরু করে। কিন্তু কোথাও মুক্তিপথের নির্দেশ দেখতে পায় না। সে দৌড়তেই থাকে। যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগি-মুখে হাল্কা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মহামারী-হাহাকার

BanglaBook.org

দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই। সে ছুটতেই থাকে।

বাইরে চাঁদ ডুবে গেছে, পাখির রব শুরু হতে দেরি নাই। টিনের ছাদ থেকে প্রায় নিঃশব্দে শিশির পড়ে। বড়বাড়িতে কে একবার কেশে ওঠে। না-শুনেও যুবক শিক্ষক সে-আওয়াজ শোনে, তার পাথরের মতো শরীরের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। তারপর আরেকটি আওয়াজ সে শুনতে পায়। এবার অন্ধকারের মধ্যেই ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সে দরজার দিকে তাকায়। মনে হয় তার অপেক্ষার শেষ হয়েছে।

দরজায় আবার করাঘাত হয়। তারপর খিল-দেয়া দরজার ওপাশে কাদেরের গলাও শোনা যায়। যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, তার শরীরে অবশিষ্ট শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাদেরকে কোনো উত্তর দেবার বা দরজা খুলবারও কোনো প্রয়োজন সে বোধ করে না। তবু যন্ত্রচালিতের মতো উঠে সে দরজা খুলে একটু সরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কাদের ঘরে প্রবেশ করলে তার দিকে তাকায় না। শুধু গভীর নীরবতার মধ্যে সে শুনতে পায় কাদেরের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

অবশেষে কাদেরের কণ্ঠ শোনা যায়। তার স্বাভাবিক কণ্ঠ রুক্ষ। এখন সে নিম্নকণ্ঠে কথা বললেও সে-রুক্ষতা ঢাকা পড়ে না। কাদের প্রশ্ন করে, সে দৌড়ে পালিয়েছিল কেন।

তার গলা শুনতে পেয়ে যুবক শিক্ষক হয়তো একটু আশ্বস্ত বোধ করে, কিন্তু প্রশ্নটির কোনো অর্থ বোঝে না। সে কোনো উত্তর দেয় না।

কাদের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে। তারপর তার গলা ঝনঝন করে ওঠে। সে কেবল তার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তিই করে। কিন্তু যুবক শিক্ষক এবারও কোনো উত্তর দেয় না। তার জিহ্বায় যেন কুলুপ পড়েছে। কাদেরের ডাকে দরজা না খোলার যেন উপায় থাকে নাই, কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর দিতে সে বাধ্য নয়। বা মুখে কোনো কথাই সরে না।

উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা কাদেরের স্বভাব নয়। তা ছাড়া, কাদের বড়বাড়ির মানুষ। যুবক শিক্ষক সে-বাড়িরই পরাপেক্ষী, তাদেরই আশ্রিত।

"কী হল?"

যুবক শিক্ষক উত্তর দেবার কোনো চেষ্টা করলেও অন্ধকারের মধ্যে তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

অবশেষে কাদের কেমন এক কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে, 'বাঁশবনে কী করছিলেন?'

যুবক শিক্ষক, পাথরের মতোই সে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বাইরে কোথাও পাখির কলতান শুরু হয়।

একটু পরে কাদের সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুই

দাদাসাহেব বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বি। দীর্ঘ প্রশস্ত মানুষ, প্রৌঢ়-বয়সেও মুখভরা একরাশ কালো দাড়ি। তবে চুল-গোঁফ সুন্নত অনুযায়ী ছোট করে ছাঁটা।

বছরপাঁচেক হল দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তার পূর্বে তিনি সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন বলে কেবল ছুটি-ছাটাতেই দেশে আসতেন। সারা জীবন চাকুরি করেছেন বটে কিন্তু চাকুরিতে কখনো মন ছিল না! মাজহাব-শরিয়ত ব্যাপারে সর্বদা মশগুল থাকতেন বলে কর্মজীবনেও বিশেষ কৃতকার্য হন নাই। উপাধি-ইনাম তো দূরের কথা, পদোন্নতিও বিশেষ হয় নাই। অবশ্য সে-জন্য সেদিনও তাঁর কোনো আফসোস ছিল না, আজও নাই। বরঞ্চ চাকুরিজীবন শেষ হলে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন : অবশেষে তিনি নিজের সময়ের ষোল আনা মালিক হলেন, তাতে কারো হিস্‌সা-দাবি থাকল

BanglaBook.org

না। তাছাড়া, এবাদতে এবং মাজ্‌হাবি কাজে সম্পূর্ণভাবে মনঃপ্রাণ দেবার পথে আর কোনো বাধা থাকল না।

অন্য একটি কারণেও চাকুরিজীবনে তিনি সুখী ছিলেন না। সে-জীবন পরাধীন যুগে কেটেছে। পরাধীনতার অবমাননা যতটা তাঁকে কষ্ট দেয় নাই ততটা দিয়েছে মনিবের বিধর্মীয়তা। বিধর্মীয় মনিব তাঁর প্রিয় ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে কোনো বিরোধিতা বা অবজ্ঞা প্রকাশ না করলেও তার সে-বিরোধিতা-অবজ্ঞা অহরহ অনুভব করেছেন। এমন মনিবের অধীনে গোলামি করা নিতান্তই পীড়াদায়ক। অবসরপ্রাপ্তিতে তাই তাঁর আনন্দের সীমা থাকে নাই।

দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি অবিলম্বে এ-কথা বুঝতে পারেন যে, অবসর গ্রহণ সময়োচিতই হয়েছে। বাড়িতে সংখ্যায় দশাধিক বালক-বালিকা। তাঁর গ্রামবাসী বড় ছেলের ছয়টি ছেলেমেয়ে। বিধবা মেয়েরও পাঁচটি সন্তানসন্ততি। তাদের শিক্ষাদীক্ষার একান্ত প্রয়োজন। সে-শিক্ষাদীক্ষা হেলা করা যায় না। তবে ভাগ্য ভালো, এখনো তাদের মন সার-দেয়া জমির মতো। তাতে যে-বীজ রোপণ করা যাবে সে-বীজই ফলবতী হবে।

প্রথম সপ্তাহে তিনি নির্দেশ দিলেন, বিস্‌মিল্লাহ্ না বলে কেউ যেন লোকমা না তোলে। শীঘ্র আরেক হুকুম হল, কারো একটি নামাজ যেন কাজা না হয়। (অবশ্য একেবারে নামাজ না পড়া কল্পনাতীত।) তারপর ঈমানের অর্থ, কোরান-পাঠ ও হাদিস-সুন্নার প্রয়োজনীয়তা, তস্‌বি-পড়ার উপকারিতা, নফল নামাজের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যান দিতে লাগলেন। মাসখানেকের মধ্যে বাড়িময় এমন ঘোরতর পরিবর্তন ঘটল যে ঝানু মোল্লামৌলবীদেরও তাক লেগে গেল। মাথা নেড়ে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, দাদাসাহেব অসাধ্য সাধন করেছেন।

সকলের বিস্ময়ের পাত্র দাদাসাহেবের মেয়েপক্ষের নাতি, আমজাদ। ঘুমে অতি সহজে কাবু হয়ে পড়ে যে ছেলে সেও একটি নামাজ কামাই করে না। একবার নিদ্রার কবলে পড়লে যার শূন্য পেটে রসজবজবে মিঠাই-মণ্ডাও একটু আলোড়ন জাগাতে পারে না সে-ই গভীর নিদ্রা থেকে উঠে ওজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, একবার ডাকতে হয় না। স্বাভাবিক কথা, আমজাদ দাদাসাহেবের বড়ই প্রিয়পাত্র।

দাদাসাহেব ওয়াজ-নছিহত করেন, কিন্তু সহজে কাউকে ভর্ৎসনা করেন না। তাঁর নিষ্পলক দৃষ্টিই যথেষ্ট। তাঁর স্তব্ধতায় ছেলেমেয়েদের বুকে এক নিমেষে হিমশীতলতা আসে। যেমন সেদিন রাতের ঘটনা। সকলে খেতে বসেছে। দস্তরখানায় স্তূপাকার খাদ্য। ডালভাত, মাছতরকারি, দু-তিন রকমের ভাজি, একটু কাসুন্দি ও গরম পাতের ঘি, ঘন লাল সুরুয়ায় বড় বড় করে কাটা গোরুগোস্ত। ছোটপাতে মুখরোচক আচার-চাটনিও কয়েক পদের। সকলেই পাতে খাবার তুলে নিয়েছে। দাদাসাহেব শ্যেনদৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকান। তারপর হঠাৎ তিনি বলেন, বিস্‌মিল্লাহ্। সঙ্গে সঙ্গে চারধারে গুঞ্জন ওঠে, বিস্‌মিল্লাহ্। কেবল একজন সে-গুঞ্জনে যোগ দিতে ভুলে যায়। আমজাদের বড় ভাই, কুদ্দুস। হয়তো সেদিন তার পেটে ক্ষুধার দাউ-দাউ আগুন, অথবা কোনো কারণে অন্যমনস্ক।

থমথমে নিস্তব্ধতা নামে। দেখা যায় দাদাসাহেব গুরুগম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কুদ্দুসের দিকে। তার মুখে তখন ঠাসা ভাত। না গিলে সে তয়ে পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকে বাসনের দিকে, চোখ তুলতে সাহস হয় না। প্রথমে কানপাটা, তারপর গোটা কান, অবশেষে সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠে। দাদাসাহেবের মুখে কিন্তু একটি কথা নাই।

পরে দাদাসাহেব শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে বলেন। খোদাকে কখনো ভুলতে নাই, বিশেষ করে যখন কেউ তাঁর অসীম দানদয়াশীলতায় শরিক্‌লাভ করে। নিঃস্বার্থতা, ত্যাগশীলতা এবং আত্মসংযম ধর্মের গোড়াঘাট। সে-সব গুণ ছাড়া দুনিয়ার কোনো সংগ্রামে তো জয়ী হওয়া যায়ই না, ক্ষমাশীল অসীম দয়াবান খোদারও প্রিয়পাত্র হওয়া মুশকিল। এ-উপদেশ দেন খেতে খেতেই। নীরব-তোজনের পক্ষপাতী তিনি নন। সুন্নার নির্দেশ হল, সদালাপের সঙ্গেই

BanglaBook.org

ক্ষুধানিবৃত্তি করা উচিত। সদালাপের জন্যে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে আর কোন বিষয় বেশি উপযুক্ত? ঠোঁটে মধুর হাসির আভাস, কণ্ঠ শান্ত স্নিগ্ধ, দাদাসাহেব একাকী কথা বলে যান। খাবার শেষে তখন হয়তো কুদ্দুসের সামান্য ভুলটার কথা কারো মনে নাই। কিন্তু খাদ্যই যে জীবনের সবচেয়ে প্রধান বস্তু নয় সে-কথা প্রমাণ করবার জন্যে সে পরদিন স্বইচ্ছায় নফল রোজা রাখে।

দাদাসাহেবের স্বাভাবিক স্থৈর্য-গাম্ভীর্যে সহজে তারতম্য ঘটে না। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি কখনো-কখনো অসংযত হয়ে পড়েন। সে-ব্যাপার ধর্ম। যে-মানুষকে দূর থেকে লম্বা-লম্বা পা ফেলে আসতে দেখলে অনেক ছেলের মনে তাঁর দৃশ্যপথ থেকে অদৃশ্য হবার প্রবল বাসনা জাগে, যাঁকে বয়স্থব্যক্তিরা সমীহ-সম্মান না করে পারে না, ধর্মের ব্যাপারে তিনিই শিশুর মতো সরল বা প্রাণবন্ত বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন।

আরেকদিনের ঘটনা। ঘটনাটির উৎপত্তি জেলা-শহরের খবর-কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদে। অজস্র ছাপাভুলসমেত মেটে কাগজে প্রকাশিত খবর-কাগজটি দেশের খবর ছাড়া বিদেশী খবরও সরবরাহ করে থাকে। অধর্মীয় পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সে-সংবাদপত্রই সময় পেলে দাদাসাহেব একনজর চেয়ে দেখেন। সেদিন সকালে তাতে একটি খবর পড়ে তিনি বেসামাল ধরনে আনন্দোৎফুল্ল হয়ে পড়েন। তাঁর হাঁকডাক শুনে সবাই ছুটে আসে। অবশ্য এত হৈ-হুলুস্থুলের কারণ প্রথমে কেউ বুঝতে না পারলেও তাঁর উত্তেজিত উজ্জ্বল মুখ দেখে কারো সন্দেহ থাকে না যে, একটি গুরুতর কিন্তু অতিশয় প্রীতিকর এবং শুভময় ঘটনাই ঘটেছে।

ব্যাপারটা খোলাসা হলে জানা যায়, জেলা-শহরের সংবাদপত্রটিতে খবর বেরিয়েছে যে আমেরিকায় একজন বিশেষ গুণী এবং ধর্মসিক্ত ব্যক্তি তাঁর দেশবাসীদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে বিষম তোড়জোড় শুরু করেছেন। হাজার হাজার নারী-পুরুষ শুনতে আসে তাঁর ওয়াজ। তাঁর যুক্তিপূর্ণ আবেদন-হুজ্জাতে এবং তাঁর উদ্দীপনা-ভরা বক্তৃতায় লোকেরা এত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যে রিভল্‌ভারধারী শতশত তাগড়া-তাগড়া পুলিশও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে পারে না।

নাকের ডগায় চশমা বসিয়ে দাদাসাহেব এবার সংযত তবু গর্বিতকণ্ঠে সংবাদটি আবার পড়ে শোনান। ততক্ষণে গোলযোগ শুনে তাঁর বিধবা মেয়ে আনোয়ারাও রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে এসে উপস্থিত হয়েছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে সংবাদটি বুঝবার চেষ্টা করে। কোথায় আমেরিকা, কী তার বাসিন্দাদের ধর্ম সে-সব পরিষ্কারভাবে তার জানা নাই। কিন্তু এ-কথা সে বুঝতে পারে যে, সেখানে ইসলাম ধর্মের গর্বিত পতাকা উঠবার বেশি দেরি নাই। আনোয়ারার রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখেও আকস্মিকভাবে বৃষ্টির ঝাপটার মতো পানি আসে।

আনন্দোচ্ছ্বসিত ব্যক্তি নিরস্ত্র। দাদাসাহেবের নিরস্ত্রভাবের সুযোগ নিয়ে তবারক হঠাৎ একটি উক্তি করে। ছেলেদের মধ্যে সে বয়োজ্যেষ্ঠ, ইস্কুলে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়ে।

'লোকটা যে হাবসী।'

চশমার ওপর দিয়ে দাদাসাহেব পরমবিস্ময়ে তার দিকে তাকান।

'দোষ কী তাতে? আমাদের মাজ্‌হাবে জাতবিচার বর্ণবিচার নাই। সকলেই খোদার বান্দা। সবাই তাঁর চোখে সমান।'

ছেলের বেয়াদবিতে আশঙ্কিত হয়ে তার মা আনোয়ারা ভর্ৎসনা করে,

'তুই চুপ কর, ফজুল কথা বলিস্‌ না।'

দাদাসাহেব তখনো অস্ত্রগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং মায়ের কথা উপেক্ষা করে তবারক আবার বলে, 'সে শুধু হাবসীদেরই মুসলমান করছে।'

এবার দাদাসাহেব কিছু দমিত হন, তাঁর উৎসাহে একটু ভাটা লাগে। হয়তো মনে একটু সন্দেহও জাগে। জানালার বাইরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবিতভাবে নীরব থাকেন। তারপর আস্তে বলেন, 'সবকিছুরই আরম্ভ আছে। আরম্ভ হয়েছে। বাকি খোদার মর্জি।'

BanglaBook.org

তাঁর মুখভাব লক্ষ করে সমাকুল আনোয়ারা আবার তার ছেলেকে ভর্ৎসনা করে।

'চুপ কর। কেন আবার ফজুল কথা বল্‌ছিস?'

'না, কোনো ফজুল কথা বলছে না।' দাদাসাহেব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলেন। ছেলেদের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। 'তবারকের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। একটুতে সে খুশি হয় না।'

তবারক প্রতিবাদ করে না। এবার নিশ্চিন্ত হলে তার মায়ের মুখ সন্তানগৌরবে রক্তিমাভা লাভ করে। সংযত-আনন্দের সঙ্গে সে দাদাসাহেবকে প্রশ্ন করে, 'বড় সুসংবাদ। ফকির-মিসকিন খাওয়ালে কেমন হয়?'

দাদাসাহেবের উৎসাহ নিচের খাদে নেবে সেখানেই আছে, মনের সন্দেহটাও কাটে নাই। কিন্তু এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সে রাতে এক অজানা মার্কিন নিগ্রোর বদৌলতে তিন গ্রামের ফকির-মিসকিন জেয়াফত পেল।

এশার নামাজের পর, ঘরে অনুজ্জ্বল লণ্ঠনের আলো, পায়ের ওপর ছক-কাটা লাল কম্বল, দাদাসাহেব কখনো কখনো ইতিহাসের গল্প বলেন। দেয়ালে দীর্ঘ ছায়া, আলো-অন্ধকারে দাদার মুখমণ্ডলে একটা অস্পষ্ট শ্রান্তির ভাব। দিনশেষে হয়তো বার্ধক্যের জন্য শ্রান্তি বোধ করেন, অথবা রাত্রির সন্নিধানে নিজের জীবনসন্ধ্যার বিষয়ে অজ্ঞাতে সচেতন হয়ে ওঠেন।

তিনি বলেন : 'কোথায় না খোদাভক্ত খোদাভীত খোদাপ্রেমিক দীনদয়াময় বীর্যবান মুসলমান ধর্মের পতাকা উত্তোলন করে নাই, কোথায় না সভ্যতার উজ্জ্বল মশাল বহন করে নিয়ে যায় নাই? তাদের জয়-বিজয় ও কৃতিত্বের কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বরে মণিমুক্তার মতো ঝলমল করে। ইরান-তুরান-খোরাসান, সামারা-সিকিলিয়েহ্-বালারাম; দূর দূর দেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারিত হয়েছে। তারা বাগদাদ-দামাস্কাস কুর্তুবা-গ্রানাদার মতো মনোরম শহর সৃষ্টি করেছে, নির্মাণ করেছে বৃহৎ-মহৎ সুদৃশ্য প্রাসাদ-দুর্গ-তোরণ-মিনার। কত নাম বলি? খুল্দ প্রাসাদ, বাবউজ্‌জাহাবের সোনালি তোরণ, বিশাল দুর্গ-প্রাসাদ, মেদিনাত্-উল-হামরা, নাইল নদীতীরে কাছর্-উল-খাবরি। তারপর শত শত মনোরম উদ্যান, শত শত শিক্ষাকেন্দ্র, বাণিজ্যবন্দর।'

কিন্তু ইতিহাসের কথা দাদাসাহেব কখনো কখনোই বলেন। ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি। তাঁর মতে, মানুষের সৃষ্টির কথা তুললে ভালো-খারাপের কথা ওঠে। দয়াবান নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র মহৎ খলিফা উমর বা রশীদ-মামুনের কথা তুললে ইয়াজিদ-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-মুতাওয়াক্কিলের নৃশংসতা হীনতা বিশ্বাসঘাতকতার কথা ঢেকে রাখা যায় না। কখনো কখনো দাদাসাহেব গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবেন, দ্বিতীয় দলই যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কী করে তাদের কথা ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায়? তাদের কথা ভাবলে কোনো-কোনো সময়ে তাঁর হৃৎকম্পনের মতো ভাব হয়। শুষ্ক হৃদয়ে ভাবেন, নির্দয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নাকি নিজেই পনের হাজার মানুষের মস্তকচ্যুত করে। একটি দুটি নয়, পনের হাজার মানুষ! ওবাইদুল্লাহ্ বিন জিয়াদ কসাই নাম অর্জন করেছিল তার নিষ্ঠুরতা হিংস্রতার জন্যে। ইতিহাসের কথা তুললে তাদের নাম কি এড়ানো যায়?

দাদাসাহেব এ কথা বোঝেন যে পাপ-মন্দের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম চিরন্তন। খোদা সত্যপথ দেখিয়েছেন মানুষকে, কিন্তু ক-জন মানুষ সে পথে চলতে পারে? তবু একটা কথা থাকে। মানুষ কুপথে কেন যায়?

একটি বিষয়ে দাদাসাহেব নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। মানুষের পঙ্কিলতা, তার চারিত্রিক দোষঘাট হিংস্রতা অমানুষিকতা কিশোর মনের জানার প্রয়োজন আছে কি? জীবনের শুরুতেই মানুষের ভুলভ্রান্তি অপচার-ব্যভিচারের কথা তাদের জানা উচিত কি? তরুণমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন আর বিশ্বাস নবজাত বলেই সুন্দর ও পবিত্র। তা ধ্বংস করা কি ঠিক? দাদাসাহেব আপন মনে প্রশ্ন করেন কিন্তু সঠিক কোনো উত্তর পান না। এবং উত্তর পান না বলেই ইতিহাসের কথা কদাচিৎই বলেন।

BanglaBook.org

অবশ্য প্রশ্নের উত্তর পান না বলে দাদাসাহেব বিচলিত হন না। তিনি পরমসত্যে বিশ্বাসী। তাঁর মতে সে সত্য কেবল আসল কিতাবেই পাওয়া যায় এবং সে-সত্য মানুষের বিগতদিনের বা বর্তমানকালের কার্যকলাপে ধ্বংস হয় না : চিরন্তন সত্যকে কখনো ধ্বংস করা যায় না। তাঁর গূঢ়বিশ্বাস, সে-কিতাবের আদেশ-নির্দেশ বাধা-নিষেধ অনুসরণ করে জীবনযাপন করলেই মানুষের মুক্তিলাভ হয়।

কখনো-সখনো তিনি ছেলেদের বংশের কথাও বলেন। বিনীতিশালীনতায় ঢাকা থাকে বলে সহজে তা পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু দাদাসাহেবের মনে বংশগৌরব কম নয়। আজ সে ধনসম্পদ বা মান-ইজ্জত নাই, কিন্তু এককালে চারধারে তাদের বড় নাম-ডাক ছিল। তখন তাঁরা বিশাল জমিদারির মালিক ছিলেন। তাঁদের ঘোড়াশালে তখন ঘোড়া ছিল, হাতিশালে হাতি। খিল্লাত পরিধান করে রেশমের খরিতায় পত্রাদি বাঁধতেন, খাশমহল আতর-বাইদ্‌মস্কের সুগন্ধিতে ফুরফুর করত এবং বিশেষ উৎসবের দিনে বাদশাহি কায়দায় পথে-ঘাটে মোহর ছড়াতেন। তখন আবদার-চোবদার রাখতেন গণ্ডায় গণ্ডায়, সাবর-সেবন্দিও পুষতেন। আজ সেদিন আর নাই। তবে সে সমারোহ জাঁকজমক আজ নাই বলে দাদাসাহেবের মনে কোনো সময়ে দুঃখ এলেও বংশগৌরবের মতোই সে দুঃখ তিনি ঢেকে রাখেন, প্রকাশ করেন না। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস, জাঁকজমক হল বাইরের খোলস, অর্থ থাকলেই সে-খোলস আসে। বংশের আসল দাম ধন-দৌলতের ওপর নির্ভর করে না। গরিব হলেও আসল খানদানিবংশের দাম পড়ে না। শুধু সোনারূপা, হাতিঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজের শানশওকাত থাকলেই একটি বংশ খানদান হয় না। খানদানির মূলভিত্তি হল নেক-চরিত্র, ধর্মের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা, সাধুতা-দয়াশীলতা, বিনয়-নিরভিমান ব্যবহার ইত্যাদি গুণাগুণ। দাদাসাহেবের বিশ্বাস, এ সব গুণাগুণ বংশপরম্পরাক্রমে তাঁদের মধ্যে প্রবহমাণ আছে। একটি তুলনায় তিনি তাঁর যুক্তির পূর্ণ সমর্থন পান। মুসলমানদের শানশওকাত আজ নাই, কিন্তু তাই তাদের অন্তস্থিত মূল্য কি কিছু কমেছে? অবশ্য এ-যুক্তি তাঁরই।

আজ সন্ধ্যায় ছক-কাটা লাল কম্বল গায়ে জড়িয়ে দাদাসাহেব প্রথমে চোখ নিমীলিত করে তস্‌বি পড়তে শুরু করেন। পায়ের কাছে কুদ্দুস, তবারক এবং আমজাদ বসে। তারা কতক্ষণ তাঁর নিমীলিত চোখের পানে তাকিয়ে থাকে, তারপর লক্ষ করে, তাঁর মুখ ভাবনাচ্ছন্ন। কিচ্ছা-কাহিনীর আশা কিছুটা ছেড়ে দিয়ে তারা শোনে বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি। থেকে থেকে পশলা বৃষ্টি নাবে কিন্তু দুরন্ত হাওয়ায় সে-বৃষ্টি শীঘ্র বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। থেকে থেকে সে-হাওয়া ভীতিবিহ্বল অন্ধ পশুর মতো জানালা-দরজায় ঝাপটা দিয়ে যায়। শীতের সন্ধ্যায় এ-অসময়ী ঝড় ছেলেদের মনে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে তোলে।

দাদাসাহেব তাঁর নিয়মিত বৈঠক শুরু না করে আপন ভাবনায় কেমন নিঝুম হয়ে থাকেন। মাথা নত করে তস্‌বি টেপেন, অস্পষ্টভাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে, দেহ নিস্পন্দ। আমজাদ একবার ঝুঁকে তাঁর চোখ দেখবার চেষ্টা করে কিন্তু তা ছায়াচ্ছন্ন বলে দেখতে পায় না। তারপর একটু ক্ষুণ্ন হয়ে সে জানালার দিকে তাকায়। ঝড়ের লেজের বাড়ি খেয়ে জানালাটি তখন থরথর করে কাঁপছে।

একটু পরে কিছু সচকিত হয়ে ছেলেরা শোনে দাদাসাহেব অনুচ্চস্বরে কোরানের একটি সুরা আবৃত্তি করতে শুরু করেছেন। চোখ পূর্ববৎ নিমীলিত কিন্তু তাঁর কণ্ঠে মিষ্টি-মধুর শব্দলহরি জেগেছে। এবার কিছুটা আশান্বিত হয়ে তারা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে, ঝড়ে আর কান দেয় না।

আবৃত্তি শেষ করে দাদাসাহেব আবার নীরব হন। তারপর যেন অপেক্ষমাণ ছেলেদের কথা স্মরণ করে আচম্বিতে ঘোষণা করেন, 'কম লোকেই বোঝে, কিন্তু তোমাদের কাদের দাদা দরবেশ মানুষ।'

BanglaPDF.org

ছেলেরা এবার অনুমান করে যে, দাদাসাহেব তাঁর ভাই কাদেরের কথা ভাবছেন। কেন জানতে ইচ্ছা করলেও তাঁর ভাবনাগ্রস্ত মুখ দেখে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে একটু অপেক্ষা করে। দাদাসাহেব আবার চোখ বুজে নীরবাচ্ছন্ন হলে তারা নিরাশ হয়ে ঝড়ের বিচিত্র আর্তনাদে কান ফেরায়।

কাদের দাদাসাহেবের কনিষ্ঠতম ভাই হলেও দু-জনের মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছরের ব্যবধান। দুনিয়ায় কাদেরের যখন আবির্ভাব হয় তখন দাদাসাহেবের ওয়ালেদ বয়োবৃদ্ধ। তখন তাঁর চোখে ছানি পড়েছে, হয়তো চরিত্রে ভীমরতির আভাসও দেখা দিয়েছে। জন্মের প্রথম দিন থেকেই অপ্রত্যাশিত শিশুসন্তান তার বাপের চোখের মণি হল। তাতে দোষ নাই। সবাই মেনে নিল তাঁর শেষ-সন্তানের প্রতি অপরিমিত স্নেহ : বৃদ্ধ বয়সে নোতুন প্রাণের সংস্পর্শে জীবনের প্রতি পুনরুদ্ভূত তীব্র অভীপ্সা কৌতূহলজনক হলেও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু চেতনাবোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে চরিত্র প্রকাশ পেল তাতে সবাই শীঘ্র সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল : তাদের আদর্শের সঙ্গে সে চরিত্র যেন ঠিক খাপ খায় না। তার অদম্য খামখেয়ালি ভাব, উগ্র মেজাজ এবং সৃষ্টিছাড়া দুরন্তপনা তাদের কাছে নেহাতই বেখাপ্পা ঠেকে। কেবল বৃদ্ধ বাপ অবিচলিত থাকেন। তার বিসদৃশ চরিত্র হয়তো তাঁর নজরে পড়ে না। পড়লেও এবং সংগোপনে তার চারিত্রিক রুক্ষতা স্নেহের মলমে মোলায়েম করবার চেষ্টা করে থাকলেও সে চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য হন না।

কাদেরের উগ্র-দুর্দান্ত স্বভাব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা না হয়ে আরো তেজী হতে থাকে। কিছুদিন সে ইস্কুল করে, কিন্তু ইস্কুলের চার দেয়ালের শক্তি কি তাকে দু-মিনিটের জন্যেও কয়েদ করে রাখে! সে যে বিদ্রোহী ছেলে তাতে সন্দেহ রইল না। কেবল কিসের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সে-কথা কেউ বুঝল না।

চোখ না খুলেই হঠাৎ দাদাসাহেব অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনে বলেন, 'দরবেশের বিদ্রোহ সাধারণ লোকে কী করে বোঝে?'

হঠাৎ একদিন সে-দুরন্ত ছেলের মধ্যে ঘোরতর পরিবর্তন এল। যেন অকস্মাৎ ঝড় থামল। বয়স তখন আঠার-উনিশ। মুখে আর কথা নাই, চলনে তেজ নাই, চোখে চোখে কারো দিকে তাকায় না। একা একা থাকে, কারো সঙ্গ পছন্দ হয় না। এই সময়ে দাদাসাহেব তাকে তাঁর কার্যস্থলে নিয়ে যান। ধর্মের ব্যাপারে কিছু শিক্ষাদীক্ষা দেবার চেষ্টা করেন, নানারকম উপদেশ-নছিহত দেন যাতে এতদিন যা বাদ পড়েছে তার কিছুটা পূরণ হয়, তার জ্ঞানবোধ আর চারিত্রিক অভাব কিছুটা কাটে। এই সময়ে কাদেরের প্রতি তাঁর পিতার অন্ধস্নেহের কিছুটা যেন তার মনেও দেখা দেয়। ইস্কুলের লেখাপড়া তার বিশেষ হল না, কারণ গোড়া থেকে শুরু করার বয়স তখন পেরিয়ে গেছে। তবে পার্থিব জ্ঞানার্জন না হলেও তার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে দাদাসাহেবের মনে কোনো সন্দেহ রইল না। তারপর একদিন সে হঠাৎ দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে।

'আমিই তাকে শিখিয়েছি। আমার হাতেই সব শিখেছে, তোমাদের কাদের দাদা', দাদাসাহেব আবার বলেন। কথাটায় আত্মদম্ভ লক্ষ করে একটু লজ্জিত হয়ে যোগ দেন, 'অবশ্য দরবেশকে কে কী শেখাতে পারে?'

দাদাসাহেবের বাপ-মা দুজনেরই অল্পদিনে ইন্তেকাল হয়েছে। কাদেরের স্বভাব পরিবর্তনের পরে আশা হল, সেই জমিজমা ঘরসংসার দেখবে। ভরসা হল চারিত্রিক বিশৃঙ্খলা কেটেছে, এবার একটু কেমন বিহ্বলতা যে দেখা দিয়েছে তাও কাটবে এবং ঘরসংসারের জটিলতা বুঝতে তার দেরি হবে না। সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

'সংসারে দরবেশের মন কখনো পড়ে না।' দাদাসাহেব আবার আপন মনে উক্তি করেন। তারপর ছেলেদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে তাদের দিকে একবার তাকান। সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, 'তোমাদের কাদের দাদার কথা বলছি।'

BanglaBook.org

অবশেষে সংসারের ভার নিল দাদাসাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র হামিদ। সিধেসাধা গোবেচারা মানুষ, সদাসর্বদা আদেশাধীন, নম্র-বাধ্য। অশেষ শ্রমসহিষ্ণুতার সঙ্গে এবং বারংবার চেষ্টার ফলে কলেজের শেষ পরীক্ষা কোনো প্রকারে পাস করলেও সকলের আশা হয় সে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করবে। যোগদান করেওছিল, কিন্তু ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো তার প্রাণ শীঘ্রই আইঢাই করতে শুরু করে। চাকুরি অসহ্য হয়ে উঠলে তাতে ইস্তফা দিয়ে দেশের বাড়িতে ফিরে আসে। নামে শুধু কাদের সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিল। হামিদের প্রত্যাবর্তনের পর সে-দায়িত্বও থাকল না।

আজ কাদের সম্পূর্ণভাবে নিষ্কর্মা। অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং অসামাজিক বলে তার মনের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তার বাইরের চেহারা স্বভাবত নিদ্রালস। নিদ্রালস ভাব কাটলে চরম উদাসীনতা নাবে তার মুখে। দাদাসাহেব বলেন, তা তার মুখাচ্ছাদন মাত্র। বিছানায় যখন লম্বা হয়ে পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তখন খাটের খুরোতে আর তাতে তফাৎ থাকে না! মাছ ধরার বাতিক জাগলে ছিপ-বঁড়শি নিয়ে পুকুরধারে গিয়ে যখন বসে তখন প্রাতঃকাল মধ্যদিনের উত্তাপ পেরিয়ে নিষ্প্রভ অপরাহ্ণে গড়িয়ে যায়, সে নড়েচড়ে না, নিস্পৃহমুখ দেখে মনে হয় তার যেন কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাই নাই। বার দুয়েক তাকে তর্ক করতে দেখা গেছে। পরিবারের কারো সঙ্গে নয়, মসজিদের এক চোখ-কানা ইমামের সঙ্গে। যুক্তিতর্কের সূত্র বেশিক্ষণ ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মতবিরোধ ঘটলে হঠাৎ তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে, কিশোর বয়সে যেমন হত। তবে শীঘ্র নিজেকে সংযত করে অপ্রস্তুত ইমামকে রেহাই দেয়। দ্বিতীয়বারও তার বক্তব্যের মূলকথা উত্তপ্ত ভাষায় বাষ্পীভূত হতে দেরি লাগে নাই। তার সাধারণ মানুষসুলভ কর্মের মধ্যে আকস্মিক বিয়েই হয়তো একমাত্র উল্লেখযোগ্য। তিন বছর আগে চির বিবাহ-বিরোধী কাদের মত বদলিয়ে হঠাৎ বিয়ে করে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আজ তার সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। অনেক সময় দীর্ঘকাল তাদের মধ্যে কথালাপ হয় না।

দরবেশ বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, সেটাই মস্ত কথা। আর দশজন জামাইর মতো ব্যবহার কীভাবে করে? একবার দাদাসাহেব তার স্ত্রী-উদাসীনতা সমর্থন করে বলেছিলেন, 'কেবল কথা বলে না। মারপিট করে কি? না, তা করে না। তবে নালিশের কারণ কী?'

কাদেরের দরবেশীলাভের ইতিহাস একদিন কিছুটা সংগোপনে দাদাসাহেব ছেলেদের বলেছিলেন। তখন সে অবিবাহিত। একদিন মধ্যরাতে সে জেগেই শুয়েছিল, হঠাৎ বাড়ির দেউড়ির কাছে থেকে কে যেন তাকে ডাকল। অপরিচিত কণ্ঠস্বর, তবু কোন বন্ধু যেন ডাকল তাকে। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজার খিল খুলে সে বেরিয়ে গেল। কাউকে দেখতে পেল না, কিন্তু তাতে নিরুৎসাহ হল না, বিস্মিত হল না, ভীতও হল না। তারপরে সে হাঁটতে থাকল। অনির্দিষ্টভাবে নয়, কারণ কণ্ঠস্বরটি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সে-রাতে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়। পরদিন সকালে যখন সে ঘরে ফেরে, তার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তহীন, কিন্তু চোখে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, অলৌকিক তৃপ্তি-সন্তোষ ভাব। সেই থেকে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রায় সাক্ষাৎ হয়।

দাদাসাহেব বলেন, 'অবশ্য মুখ খুলে এসব কথা সে কখনো বলে নাই। এসব কথা কেউ মুখ খুলে বলে না।' কী করে কথাটা তিনি জানতে পেরেছেন তা তিনি পরিষ্কার করে বলেন না।

আজ ঝোড়ো সন্ধ্যায় দাদাসাহেব ধর্মোপদেশ না দিয়ে, নীতিমূলক কিচ্ছা-কাহিনী না বলে কাদেরের কথাই কেন ভাবছেন, তার কারণ আছে। সকালবেলায় তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকালে তিনি লক্ষ্য করে দেখেন, তার মুখ ফ্যাকাসে ও রক্তহীন। তাঁর বুঝতে দেরি হয় না কেন। তবে তার চোখ দেখে তিনি অতিশয় বিস্মিত হন। তাতে কেমন তীক্ষ্ণ খরধার। শুধু তাই নয়। এক পলকের জন্যে সে এক বিশেষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকায়, যার অর্থ তিনি বোঝেন না। ইশারায় সে যেন তাঁকে কিছু জানাতে চায়।

BanglaBook.org

সে-দৃষ্টি সারাদিন দাদাসাহেবকে নিপীড়িত করেছে, তার সঙ্গে নির্জনে একটু আলাপের জন্যে, তাকে দু-একটা প্রশ্ন করবার জন্যে একটি প্রবল বাসনা থেকে থেকে তিনি বোধ করেছেন।

বিষাদাচ্ছন্নকণ্ঠে দাদাসাহেব উচ্চস্বরে বলেন, 'বলবার হলে সে-ই বলবে। আমার পক্ষে জিজ্ঞাসা করাটা সমীচীন হবে না।'

বাইরে ঝড় থেমেছে। রুদ্ধ জানালার দিকে একবার তাকিয়ে দাদাসাহেব পিঠ সোজা করে বসেন। বড়ঘরে দেয়ালঘড়িতে সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজে। ছেলেদের দিকে তাকাবার আগে আরেকবার ভাবেন কাদেরের কথা। ভাবেন, অবশ্য এ কথা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না, কিন্তু বুজুর্গ মানুষ সহজে দেখা দেন না। দরবেশ না হলে কাদের কি বুজুর্গের দেখা পেত? না, কাদের যে দরবেশ তাতে সন্দেহ নাই।

তারপর চোখ খুলে তিনি ছেলেদের দিকে তাকান। একটু কেশে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন, 'আজ তোমাদের প্রিয় পয়গম্বরের ইন্তেকালের কথা বলব।'

তিন

শীতের মিষ্টিরোদ ইস্কুলের নেড়ে প্রাঙ্গণেও স্নিগ্ধ সোনালি আলো ফেলেছে। এক কোণে পাতাবাহারের গাছে সে আলো ঝলমল করে।

চুনবালিতে লেপা বাঁশের দেয়াল, কাঠের ঠাট, ওপরে তরঙ্গায়িত টিনের ছাদ। ছাত্রদের সামনের বার্নিশশূন্য বেঞ্চিতে কালির দাগ, অনেক গ্রীষ্মের ঘামের ছাপ, এখানে-সেখানে ছুরির নির্দয় আঁচড়। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার টেবিলের পেছনে বসে যুবক শিক্ষক আরেফ আলী। গায়ে নিত্যকার মতো সামান্য ছাতাপড়া, জীর্ণ সবুজ আলোয়ান, পরনে আধা-ময়লা সাদা পায়জামা, পায়ে ধুলায় আবৃত অপেক্ষাকৃত নোতুন পাম্প-সু। অভ্যাসমতো টেবিলের তলে সে অবিরাম ডান পা নাড়ে। পা-টি যেন কলযন্ত্রে চালিত হয়।

আরেফ আলীর বয়স বাইশ-তেইশ। কিন্তু তার শীর্ণ মুখে, অনুজ্জ্বল চোয়ালে বয়োতীতভাব : যৌবনভার সে যেন বেশিদিন সহ্য করতে পারে নি। সে-মুখে হয়তো যৌবনকণ্টক জন্মেছিল, কখনো যৌবনসুলভ পুষ্পোদগম হয় নাই। কয়েক বছর আগে মাদ্রাসা-হাদিসের প্রভাবে দাড়ি রেখেছিল, আজ সে-দাড়ি নাই। কিন্তু এখনো মনে হয় থুতনির নিচে কেমন উলঙ্গতার ভাব। খাড়া নাক চিকন, কপাল ঈষৎ সমুন্নত, চোখে একটু কাঠিন্যভাব। তবে রসশূন্যস্বাস্থ্যের জন্যেই তার চোখ কঠিন মনে হয়। লক্ষ্য করে দেখলে সে-চোখের সরলতা, সময়ে-সময়ে অসহায়তাও নজরে পড়ে। কখনো-কখনো তার মধ্যে উদ্ধতভাব ও দম্ভ দেখা যায়, কিন্তু সেটা শিক্ষকতা করে বলে চড়ানো ব্যাপার। তবু একটু অহঙ্কার নাই যে তা নয়। দম্ভ-ঔদ্ধত্য না হোক, শিক্ষক হলে অহঙ্কার না হয়ে পারে না। তবে সেটা কৃত্রিম নয় বলে সযত্নে ঢেকে রাখে, শুধু ক্বচিৎ-কখনোই তার আভাস পাওয়া যায়।

আরেফ আলী অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। এক সময়ে হঠাৎ সচেতন হয়ে সে লক্ষ্য করে, ছাত্রদের কোলাহল ঝড়ের বেগ ধারণ করেছে। শিক্ষকের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে তারা সংযমের লাগাম ছেড়ে শোরগোল শুরু করেছে এবং সে-শোরগোল এমন এক উচ্চ খাদে উঠেছে যে সেখানে ব্যক্তিগত কণ্ঠের কোনো চিহ্ন নাই। সে-জন্যেই মনে হয় ঝড় বইছে।

অন্যদিন তীক্ষ্ণগলায় তবু হৃদ্যতার সঙ্গে শিক্ষক আরেফ আলী আঙুল নেড়ে শাসন করত। আজ কেমন শ্রান্তগলায় বলে, 'না না, গোলমাল করো না।'

ছাত্রদের কোলাহল দু-এক খাদ নিচে নেমে একটু অপেক্ষা করে, তারপর আবার সে উচ্চপদে আরোহণ করে। কিছুক্ষণ সময় কাটে। অবশেষে আরেফ আলী এধার-ওধার তাকায়। আওয়াজটা কোত্থেকে যে আসছে তা যেন বুঝতে পারে না। পূর্ববৎ শ্রান্তগলায় বলে, 'কী? বললাম না গোলমাল করো না?'

BanglaBook.org

শিক্ষকের দৃষ্টি ছাত্রদের উপর নিবদ্ধ থাকে বলে এবং তার মন অন্যত্র ফিরে যায় না দেখে কোলাহল হঠাৎ থামে। যেন ঝড় থামে। একটু দম নিয়ে যুবক শিক্ষক আবার এধার-ওধার তাকায়। কেন তাকায়, নিজেই তা বোঝে না। তারপর অভ্যাসবশত অন্যদিনের মতো আমজাদকেই প্রশ্ন করে, 'বলো, তিনটি পর্বতমালার নাম বলো।'

শান্তচিত্ত হয়ে যেন যুবক শিক্ষক শিক্ষকতার কাজ শুরু করে, ছাত্ররাও হঠাৎ পাঠানুরাগী হয়ে ওঠে। আমজাদ দ্বিধা না করে বলে,

"হিমালয়।"

"তারপর?"

"আরাবল্লী।"

"তারপর?"

"বিন্ধ্যাচল।"

"বেশ। মনে রেখো, হিমালয় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পর্বতমালা। দৈর্ঘ্যে, উচ্চতায়, ঘনত্বে তার সেরা নাই।"

সামনের বেঞ্চি থেকে একটি ছেলে ডাকে "স্যার?"

"বলো।"

"হিমালয় দেখেছেন?"

দরিদ্র যুবক শিক্ষক, কোপন নদীর ধারে ক্ষুদ্র চাঁদপারা গ্রামে তার জন্ম। কষ্টেসৃষ্টে নিকটে জেলা শহরে গিয়ে আই.এ. পাস করেছে, সুপরিচিত নদী-খাল-বিল ডোবা-মাঠ-ঘাট সুদূরপ্রসারী ধান ফসলের ক্ষেতের বাইরে কখনো যায় নাই। সমতল বাংলাদেশের অধিবাসী, পর্বতমালা কখনো দেখে নাই। বই-পুস্তকে, সাময়িক পত্রিকা-সংবাদপত্রে কোনো কোনো পর্বতের ছবি দেখেছে, কিন্তু অনেক পর্বতের শুধু নামই শুনেছে। এণ্ডিজ, উরাল, ককেসিয়ান আলতাই পর্বতমালা। কত নাম। সব স্বপ্নের মতো শোনায়।

'না। হিমালয় দেখি নাই। হিমালয় দেখার সৌভাগ্য হয় নাই।' কিছুটা ক্ষুণ্ন কিন্তু পরিষ্কারকণ্ঠে যুবক শিক্ষক জবাব দেয়।

যুবক শিক্ষকের মনে ইস্কুল ঘরের পারিপার্শ্বিকতা এবং শিক্ষকতার কাজ সাধারণ রূপ ধারণ করেছিল। হয়তো দেখা না-দেখার কথাতেই হঠাৎ নিমেষের মধ্যে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটি ভয়াবহ দৃশ্য আবার তার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়। তারপর কেউ যেন তার শরীরের রক্তপানি শুষে নেয়, শূন্য শরীর অপরিসীম শ্রান্তিতে অবশ হয়ে আসে। দমকটা কাটলে সে আপন মনে বলে, হিমালয় সে দেখে নাই। বস্তুত, সে কিছুই দেখে নাই। দরিদ্র শিক্ষক, কিছুই তার দেখার সৌভাগ্য হয় নাই।

সজোরে নিশ্বাস নিয়ে যুবক শিক্ষক তারপর জানালা দিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যালোকের দিকে তাকায় কিন্তু সে-আলো সে দেখতে পায় না। একটি দৃশ্যই কেবল তার চোখে ভাসে। সে-দৃশ্য থেকে তার নিস্তার নাই, তার মনে-প্রাণে ও দেহের রক্তে রক্তে তার বিভীষিকাময় ছায়া।

কিছুক্ষণ পর যুবক শিক্ষক অস্পষ্টভাবে শুনতে পায়, ক্লাসঘরে আবার কলরব জেগেছে। কিন্তু তাদের শাসন না করে সে সর্বাঙ্গে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। সে যে কেবল দৃশ্যটিই দেখে তা নয়, একটি মানুষের মুখও বারবার দেখতে পায়। আসলে সে-মুখই যেন ভয়াবহ দৃশ্যটিকে ঢেকে দেয়, এবং সে-মুখ ভয়াবহ মনে না হলেও প্রতিবার তার জন্যেই তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, শরীরেও কাঁপুনি ধরে। তবু বারেবারে মনশ্চক্ষুতে মুখটিকে সে চেয়ে-চেয়ে দেখে।

তারপর হয়তো ছাত্রদের কোলাহল অসহনীয় হয়ে ওঠে। অথবা অতি বিচিত্র মানসিক অবস্থার মধ্যেও কর্তব্যের কথা তার স্মরণ হয়। আবার সজোরে নিশ্বাস নিয়ে সে ছাত্রদের দিকে তাকায়। তাদের মুখ কেমন অস্পষ্ট মনে হয়। দুর্বলকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, 'কে বলবে

BanglaBook.org

এবার?'

সে শাসন না করলেও গোলযোগ সহসা শান্ত হয়। যুবক শিক্ষক অবশেষে মতিনকে দেখতে পায়। ঘোর-কালো ছেলে, কিন্তু বড় বড় চোখ টলটল করে।

'তুমি বলো। তিনটে উপদ্বীপের নাম বলো।'

যুবক শিক্ষক মতিনের দিকে তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তার উত্তর তার কানে পৌঁছায় না। কেবল শোনবার ভঙ্গি করে ঘন ঘন মাথা নাড়ে। তার ডান পাও আবার অভ্যাসমতো নড়তে শুরু করেছে।

মতিনের গলার স্বর থামলে অজান্তেই সাধুতার পরিচয় দিয়ে যুবক শিক্ষক প্রশ্ন করে, 'বলেছ তিনটি উপদ্বীপের নাম?'

'বললাম তো।'

'বেশ বেশ।' যুবক শিক্ষক আবার সজোরে নিশ্বাস নেয়। ছেলেদের মুখ যেন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এবার তাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অকারণে কেমন বেদনা বোধ করে। 'বেশ। তাহলে এবার তিনটে দীর্ঘতম নদীর নাম বলো।' এধার-ওধার চেয়ে আবার আমজাদের ওপরই আঙ্গুল নিবদ্ধ করে।

'তুমিই বলো।'

দু-বছর আগে আরেফ আলী শিক্ষক হয়ে এ গ্রামে আসে। থাকার আশ্রয় পায় বড়বাড়িতে। খাওয়াদাওয়াও সেখানেই হয়। তার বদলে বড়বাড়ির ছেলেদের দুই বেলা ঘরে পড়ায়। তার বিশ্বাস এই যে, যত নেয় তত সে দেয় না, কিন্তু সেটা দয়াশীল দাদাসাহেবেরই ব্যবস্থা। দাদাসাহেবের প্রতি তাই তার ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নাই।

দক্ষিণে তিন মাইল দূরে তার নিজের গ্রাম। দরিদ্র সংসার, হাতের তালুর মতো এক টুকরো জমিতে জীবনধারণ চলে না। টেনে-হিঁচড়ে আই.এ. পাস করে সে দেশে ফিরে আসে। পড়তে পারলে আরো পাস করত, কিন্তু কলেজের ফি, বইখাতা কেনার পয়সা আর যোগাড় হয় না। তাছাড়া, জেলাশহরে ঘুপ্‌সি-আস্তানায় থাকলেও খরচ হয়। এক রত্তি শাকসবজির জমিটাও বিক্রি করে উচ্চশিক্ষার পশ্চাতে ছোটার অর্থ হয় না।

বর্তমান চাকুরিতে আরেফ আলীর অসন্তোষের কারণ নাই। বরঞ্চ তার বিশ্বাস, ভাগ্য দয়াবান না হলে এমন চাকুরি সহজে মিলত না। ইস্কুলটি এখনো উচ্চ ইস্কুলে পরিণত হয় নাই বটে তবু নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ-অধ্যয়নের দরজা খোলা হয়েছে। আশা এই যে, দু-এক বছরের মধ্যে সর্বশেষ শ্রেণীও খোলা সম্ভব হবে। সরকারি অর্থ-সাহায্যের জন্যে যথাযথ আর্জি পেশ করা হয়েছে। শীঘ্র সে সাহায্যও পাওয়া যাবে সকলের ভরসা। বড়বাড়ির উদ্যম ও আর্থিক সাহায্যে এ-ইস্কুলের পত্তন পড়ে। কিন্তু এখন সেদিনের ক্ষুদ্র ইস্কুলটি আর নাই; এ-কে পোষা বড়বাড়ির সামর্থ্যের বাইরে। সরকারি সাহায্য ছাড়া ইস্কুলটির উন্নতি সম্ভব নয়। অবশ্য নিরাশাবাদীদের মতে সরকারি অর্থ সাহায্য পাওয়ার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে। নিকটবর্তী জেলাশহরের দুটি উচ্চ ইস্কুলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবলই বাগাড়ম্বর নয়। এ-ইস্কুল ক্রমশ তাদের আয়ে হস্তক্ষেপ করছে সেটা সহনীয় ব্যাপার নয়। সুতরাং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থামাবার জন্যে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আরেফ আলী কিন্তু নিরাশ বোধ করে না। ইস্কুলের এবং সাথে সাথে নিজেরও আর্থিক এবং পদোন্নতির বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তাছাড়া, বর্তমান অবস্থাই-বা তেমন বিশেষ খারাপ কী? দাদাসাহেবের অভিভাবকত্ব শুধু যে লাভজনক তা নয়, পিতৃহীন যুবকের জন্যে একটা নিরাপদ স্নেহশীল ছাতার মতো।

হাতে যে-সামান্য টাকা আসে মায়না বাবদ, তা প্রায় না ছুঁয়ে বৃদ্ধা মায়ের হাতে দিয়ে আসে। মাকে টাকা দেবার সময় প্রতিবার তার অন্তরে কী একটা ভাব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, চোখে প্রায় পানি আসে। কিন্তু সে-আবেগ অপ্রীতিকর ঠেকে না। অন্তর শান্ত হলে একটা

Banglabook.org

সুখবোধ আসে। তখন তার মনে হয়, জীবনে যেন এই সর্বপ্রথম সে সুখবোধ অনুভব করছে। তবে নবজাত এই সুখবোধকে সরাসরি আলিঙ্গন করতে সাহস হয় না, লাজুক মানুষের মতো অজ্ঞাত আগন্তুকটিকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে। তবু তার সহবাস ভালোই লাগে। একটি হাসিখুশি প্রফুল্লচিত্ত সঙ্গী জুটেছে যেন।

হঠাৎ সচেতন হয়ে যুবক শিক্ষক লক্ষ করে, ক্লাসঘরে অখণ্ড নীরবতা। কপালে হাত রগড়ে ভ্রূ উঠিয়ে সে নির্বাক ছাত্রদের পানে তাকায়। দেখে, সবাই নিষ্পলকদৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। অপ্রস্তুত হয়ে সে ছাত্রদের শাসন করতে গিয়ে থেমে যায়। ছাত্ররা গোলমাল করছে না, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বাঁদরনাচও দেখছে না। এধার-ওধার তাকিয়ে অবশেষে আমজাদকে জিজ্ঞাসা করে, "কী? বলেছ উপদ্বীপের নাম?" আমজাদ প্রতিবাদ করার আগেই সজোরে মাথা নেড়ে বলে, "কী বলছি! উপদ্বীপ নয়, নদীর নাম।"

আমজাদ নিরুত্তর হয়ে থাকলে পেন্সিল দিয়ে টেবিলে আওয়াজ করে কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে আরেফ আলী বলে, "কী? ভুলে গেছ সব?"

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর আমজাদ শিক্ষকের দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে, "স্যার, আপনার আজ শরীর ভালো নয়?"

হঠাৎ এমন প্রশ্নের জবাবটা ঝট্ করে আসে না। যুবক শিক্ষক কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। নিদ্রাহীন রাত্রি বিচরণের ছাপ নিশ্চয় তার চোখে-মুখে স্পষ্টভাবে লেখা। তার আচরণও কি ছাত্রদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে?

অবশেষে নিরাশমুখে পেটে হাত বুলিয়ে সে বলে, "বোধহয় একটু বদহজম হয়েছে।" পরমুহূর্তেই সে-কথা উড়িয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে আদেশ দেয়, "উপদ্বীপের নাম বলেছ, এবার তিনটি দীর্ঘতম নদীর নাম বলো, আমজাদ।"

আমজাদ বলে না যে ইতিপূর্বে সে তিনটি নদীর নাম একবার বলেছে। নত মাথায় শুষ্ককণ্ঠে সে পুনর্বার বলে। অন্য ছাত্ররা একটি কথা বলে না।

দাহজ্বরাগ্রস্ত মানুষ যেমন স্নেহস্পর্শ অনুভব করে কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি যুবক ছাত্রদের স্নেহজাত উদ্বেগ সে নীরবেই গ্রহণ করে। সে বোঝে তার মানসিক কষ্ট-যন্ত্রণা বিভাজ্য নয়, কারো সাথে তার ভাগাভাগি সম্ভব নয়। কারণ তার জন্মকথা প্রকাশ করা যায় না।

অপরিসীম দুঃখের সঙ্গে সে ভাবে, এ কী হল তার? কিন্তু কী যে তার হয়েছে তা সে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারে না। সে একটি গোলকধাঁধায় ঢুকেছে, যার আকৃতি-পরিধি কিছুই জানে না, যার অর্থ সে বোঝে না। সে-গোলকধাঁধায় পরিচিত জগতের কোনো চিহ্নও নাই।

ঘণ্টা বাজার একটু আগে হঠাৎ যেন তার জ্বর ছাড়ে। চিন্তাধারা সংযত হলে সে এবার সামান্য লজ্জাও বোধ করতে শুরু করে, কারণ তার মানসিক অবস্থার কোনো যুক্তিসঙ্গত হেতু সে খুঁজে পায় না। গোলকধাঁধায় যেন সূর্যরশ্মি প্রবেশ করেছে। সে বুঝতে পারে, বাঁশঝাড়ের দৃশ্যটির সঙ্গে তার কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ নাই। দৃশ্যটি অতি বীভৎস তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সে শুধু তার ক্ষণকালের দর্শকমাত্র। একবার দেখেছে, আর দেখবে না। দেখে মনে যে আঘাত পেয়েছে, সে-আঘাতও স্থায়ী হবে না। তাছাড়া, সে-দৃশ্যটির সঙ্গে কোনো পাপ-নৃশংসতা জড়িত, সে-পাপ-নৃশংসতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

মনে সামান্য শক্তির সঞ্চার হলে যুবক শিক্ষক ছাত্রদের বলে, "বলো, কে আমাজন আবিষ্কার করেছিল?" তারপর হঠাৎ একটি কথা স্মরণ হলে বলে, "না, তোমাদের বইতে তার নাম নাই। পনের শ শতাব্দীতে ভিনসেণ্ট পিনজোন সর্বপ্রথম আমাজন নদীটি আবিষ্কার করে। তবু বহুদিন সে-নদী রহস্যময় ছিল। কিন্তু আজ সে-নদী সম্বন্ধে কিছুই মানুষের অজানা নাই।" একটু থেমে যুবক শিক্ষক আবার বলে, "সে-রহস্যও নাই, নদীটির সম্বন্ধে

সে–রূপকথাও নাই। অজ্ঞানতায় রহস্য–রূপকথার জন্ম হয়।"

হঠাৎ শিক্ষকের কানে ঝাঁঝ ধরে। মনে হয় কান দুটি জ্বলে যাচ্ছে। সজোরে সে প্রশ্ন করে, "আমাজন নদীর আবিষ্কারকের নামটি বল।"

ছাত্ররা চুপ করে থাকে। নতুন বিদেশী নামটি তারা ধরতে পারে নাই। কোনো উত্তর না পেলে যুবক শিক্ষক কিন্তু আবিষ্কারকের নামটি দ্বিতীয় বার বলে না। তার মনে হয়, কানের ঝাঁঝটা আরো বেড়েছে যেন। সে ভাবে : তাই, কেন সে পালিয়ে গিয়েছিল? কেমন করে সে এ–কথা ভাবতে পেরেছিল যে বীভৎস দৃশ্যটির সঙ্গে কাদের জড়িত থাকতে পারে?

অবশেষে ক্লাস বদলের ঘণ্টা বেজে ওঠে। ভূগোলের বই বন্ধ করে যুবক শিক্ষক উঠে দাঁড়ায়। পায়ে অসীম দুর্বলতা, তবে মাথাটা পরিষ্কার মনে হয়। লজ্জাভাবের রেশটা এখনো কাটে নাই, কিন্তু সে একটা গভীর স্বস্তি বোধ করে।

চার

দু'বছর ধরে বড়বাড়ির বাইরের ঘরে বসবাস, তবু কাদেরের সঙ্গে মুখামুখি হবার সুযোগ কমই হয়েছে। মুখামুখি হলেও কথালাপ হয় নাই। তবু তার সম্বন্ধে যুবক শিক্ষক কখনো কখনো গভীর কৌতূহল বোধ করেছে। হয়তো তার সম্বন্ধে দাদাসাহেবের খেয়ালটির কোনো ভিত্তি নাই, তবু দরবেশী ব্যাপারে কে নিশ্চিত হতে পারে?

আজ রাতে যুবক শিক্ষক শান্তচিত্তে তাকে ভালো করে চেয়ে দেখে। খাটো মানুষ, কিন্তু বংশজাত চওড়া হাড়। কালো রং, চেহারার গঠন ধারালো। তবে তার চেহারায় দুটি জিনিস শীঘ্র চোখে পড়ে। প্রথমত, তার অর্ধ–নিমীলিত চোখ। সে যেন নিদ্রা–জাগরণের মধ্যে কোথাও সর্বদা বিরাজ করে। নিদ্রাবিষ্ট চোখের প্রভাব তার সারা মুখেও বিস্তারিত। দ্বিতীয়ত, তার মাথায় চুলের বাহার। তেল–চকচকে মাথায় সযত্নে সিঁথি কাটা, একটি চুলও অস্থানে নাই। তার অর্ধঘুমন্ত মুখে সে চুলের বাহার কেমন বেমানান মনে হয়।

কাদের মশারি সরিয়ে যুবক শিক্ষকের বিছানার একপ্রান্তে বসে। তার অর্ধ–নিমীলিত দৃষ্টি ছোট টেবিলে স্থাপিত লণ্ঠনের ওপর নিবদ্ধ। কেমন মনে হয়, যুবক শিক্ষকের এ–সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্বন্ধে সে সচেতন এবং এ–পরীক্ষায় তার আপত্তি নাই। বরঞ্চ স্ব–ইচ্ছায়ই যেন সে তার পরীক্ষাধীন হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে যুবক শিক্ষকের ভয় হয়, কানে আবার ঝাঁঝ ধরবে বুঝি। ভাগ্যবশত, কাদের এমন সময় একটু নড়ে ওঠে। হয়তো সে বুঝতে পারে, পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আলগোছে সে এধার–ওধার তাকায়। টেবিলের ওপর দু–একটা বইয়ের ওপর তার নজর পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। অবশেষে লণ্ঠনের ওপরই তার দৃষ্টি ফিরে আসে।

শীঘ্র যুবক শিক্ষক অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। একই বাড়িতে দু–বছর বসবাস করে যার সঙ্গে কখনো কথালাপ হয় নাই এবং যার সঙ্গে গত রাতে অতি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, গভীর রাতে তার এ আগমন এবং আগমনের পরেও তার গভীর নির্বাকতা বেশিক্ষণ স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করা মুশকিল। কী জন্যে সে এসেছে? তার সম্বন্ধে যুবক শিক্ষকের মনে যে একটি অদ্ভুত সন্দেহ জেগেছিল, সে সন্দেহটি দূর করতে এসেছে কি? তার সন্দেহটি কাদেরকে হয়তো সারাদিন পীড়া দিয়েছে।

একটা অস্পষ্ট সহানুভূতিতে যুবক শিক্ষকের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু নীরব লোকটিকে কী বলবে বুঝে পায় না। মনে সন্দেহটা কেটেছে বলে কথাটা ভাবতেই মনে লজ্জা আসে। তার পক্ষে সে কথা তোলা সহজ নয়।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে কাদের কিছু বলে ওঠে। যুবক শিক্ষক তার কথাটা ঠিক ধরতে পারে না। কেবল কাদের কথা বলেছে বলে একটা স্বস্তির ভাব বোধ করে। নম্রকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, "কী বললেন?"

BanglaBook.org

কাদেরের দৃষ্টি পূর্ববৎ লণ্ঠনের ওপর নিবদ্ধ। একটু চুপ থেকে সে কেমন খনখনে গলায় বলে, "তোস্‌তারী কিংখাবের কথা বলছিলাম।"

আরেকটি বিসদৃশ জিনিস : খনখনে গলা। মুখের সঙ্গে মানায় না!

"তোস্‌তারী কিংখাব?"

"শোনেন নাই?"

গলা আরো নম্র করে যুবক শিক্ষক উত্তর দেয়, "না।"

"পুরোনো আমলের জিনিস। সিন্দুকে তালাবন্ধ থাকে।"

যুবক শিক্ষক বোঝে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো মূল্যবান বস্তুর কথা কাদের বলছে, কিন্তু সে কথার আকস্মিক উথাপনের অর্থ সে বোঝে না। হঠাৎ তার সন্দেহ হয়, গত রাতের ঘটনা বা তার প্রতি যুবক শিক্ষকের যে সন্দেহ জেগেছিল, সে-ঘটনা বা সে-সন্দেহ তার আগমনের কারণ নয়। তাদের বংশের তোস্‌তারী কিংখাবের কথাও যে তাকে বলতে এসেছে, তা নয়। কাদের নিঃসঙ্গ মানুষ। গত রাতে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তাদের সাক্ষাৎ হলে হঠাৎ সে কি তার প্রতি একটা বন্ধুত্ব-ভাব বোধ করতে শুরু করেছে?

"দামি জিনিস হবে।" অবশেষে যুবক শিক্ষক উত্তর দেয়। সে যে তোস্‌তারী কিংখাবের মূল্য বুঝতে পেরেছে সে-কথা কাদের উপলব্ধি করেছে কিনা তাই দেখবার জন্যে তার দিকে একবার তাকায়। কাদের তার দৃষ্টি লক্ষ করে না। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থাকার পর যুবক শিক্ষক ভাবে তাকে প্রশ্ন করবে তোস্‌তারী কিংখাব আসলে কী জিনিস, এমন সময় কাদের হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। একটু ইতস্তত করে অবশেষে খনখনে গলায় বলে, "চলেন যাই।"

যুবক শিক্ষক সহসা কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হয় না। শেষে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করে, "কোথায়?"

"এখনো বাঁশঝাড়ে পড়ে আছে। কেউ খবর পায় নাই।"

কথাটি এমন সাধারণ শোনায় যেন তা যুবক শিক্ষকের মনে তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। তারপর হঠাৎ কাদেরের কথার মর্মোদ্ধার করার আগেই যেন একটা দুর্বোধ স্রোত প্রবলবেগে এসে তাকে স্থানচ্যুত করে। দুপুরবেলা থেকে তার মনে দুনিয়াটা স্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছিল। মধ্যরাতে তার ঘরে কাদেরের উপস্থিতিও সে যে শুধু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিল তা নয়, তাদের কেমন বন্ধুত্বের আভাস পেয়ে তার মন উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। কাদেরের প্রস্তাবে এবার সব ধূলিসাৎ হয়ে যায়। না, সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

যুবক শিক্ষকের উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে দেখে কাদের আবার বলে, "বাঁশঝাড়ে জন্তু-জানোয়ার আসে।"

যুবক শিক্ষক তখন লণ্ঠনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। এবারও সে কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হয় না। সে কী উত্তর দেবে? মনটা তার কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। কী একটা কথা ধরবার চেষ্টা করে বলে সারা মনে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়, কিন্তু কথাটি শুধু কাদায় নয় লতাপাতা-আগাছায়ও জড়িয়ে আছে।

"চলেন।" আরেকটু অপেক্ষা করে কাদের আবার বলে। চলার ভঙ্গি করে বলে তার জুতায় একটু শব্দ হয়।

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, তার পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়। কাদেরের প্রস্তাবটি বুঝতে না পারলেও সেটিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা তার নাই। সত্যাসত্য, সাধারণ-অসাধারণ উচিত-অনুচিত বিচার করাও যেন আর সম্ভব নয়। মনের কথাটি উদ্ধার করবার চেষ্টায় শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, শরীরে কোথাও কাঁপনও ধরেছে।

তবু সাহসের জন্যেই যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে কাদেরের দিকে তাকায়। তার মুখের পাশটা কেবল দেখতে পায়। কপালটা খাড়া, কিন্তু অর্ধ-নিমীলিত চোখে বেদনার আভাস। তার মুখে ভীতিজনক কোনো ছায়া তো নাই-ই বরঞ্চ তাতে অতি নিরীহ, এমনকি একটু অসহায় ভাবও

BanglaBook.org

বিস্মিত হয়ে সে কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অকস্মাৎ যুবক শিক্ষক যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ায়। ঘরের কোণে খড়ম ছেড়ে পাম্প-সু পরে, টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেয়। কাদের তখন খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। বাইরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের জন্যে চৌকাঠের মধ্যে তার শরীরের ছায়া জেগে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে সে যেন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। যুবক শিক্ষক কিন্তু তার দিকে আর স্পষ্টভাবে তাকায় না।

সন্ধ্যার পর ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এখন চাঁদ আর ছিটেফোঁটা কয়েকটা তারা ছাড়া সম্পূর্ণ আকাশ শূন্য। স্থানে স্থানে মাটি ভেজা, গাছের সিক্ত পাতায় আলোর ঝলকানি। যুবক শিক্ষক কোনো দিকে তাকাবার প্রয়োজনও বোধ করে না। চতুর্দিকে অন্ধকার দেয়াল, যে-দেয়ালের জন্যে বাস্তব জগতের সঙ্গে হঠাৎ তার সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অন্যান্য দিনের মতো সে আজও সুপরিচিত পথে চলেছে কিন্তু যে-অবাস্তব জগতে সে প্রবেশ করেছে সে-জগতের সঙ্গে সত্যিকার পারিপার্শ্বিকতার কোনো সম্বন্ধ নাই। তার পরিচিত জগৎ সে যে আর দেখতে পায় না তাতে তার দুঃখ হয় না, বরঞ্চ তাতে সে স্বস্তিই পায়। তবে এমন স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সে-জগৎ পরিত্যাগ করতে পেরেছে বলে মনে একটু বিস্ময় হয়। যে-দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবেষ্টিত জগতের মধ্যে মানুষ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তার আলিঙ্গন থেকে এত সহজেই যে মুক্তিলাভ করা সম্ভব সে-কথা সে জানত না। চোখের পলকেই সে তার সীমানা অতিক্রম করেছে। এ-নূতন জ্ঞান শীঘ্র তার মনে একটা বিচিত্র নেশার সৃষ্টি করে। ক্ষণকালের জন্যে তার হৃদয়ে কম্পন উপস্থিত হয়। ভয়ে নয়, কেমন একটা উত্তেজনায়। বাঁশঝাড়ে মৃতদেহের কাছে নয়, সে যেন অভিসারে চলেছে।

খানিকটা পথ গিয়ে তারা লাঙ্গল-দেয়া ক্ষেতের পাশে আইল পথ ধরে। পাশে ছোট সেচনী-নালা। একটু দূরে রাতে-পরিত্যক্ত সেঁউতি নজরে পড়ে। মনে হয়, একটি মানুষ হাত বাড়িয়ে উবু হয়ে বসে আছে। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে কাদের আস্তে বলে, "সেকালে তোস্‌তারী কিংখাব বড় মশ্‌হুর ছিল।"

পাশে ক্ষুদ্র নালায় স্বচ্ছ আকাশের প্রতিবিম্ব। নিঃশব্দ রাতে তাদের দু-জনের পায়ের শব্দ। তারা দ্রুতপায়ে চলে। একটু পরে কাদেরের উক্তিটা যুবক শিক্ষকের কানে পৌঁছায়। উক্তিটি অর্থহীন মনে হয়, তবু তাতে সে বিস্ময় বোধ না করে বরঞ্চ স্বস্তিই বোধ করে। অবাস্তব জগতে প্রবেশ করেও বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ যে একেবারে ছিন্ন হয় নাই, কোথাও যে দুটির মধ্যে একটি অদৃশ্য বন্ধন আছে, উক্তিটি সে-কথাটাই যেন ঘোষণা করে। তাই মনে স্বস্তি আসে। অবাস্তব জগৎও নেহাত স্বাভাবিক। তাতে কিছু অসাধারণত্ব নাই। দুটি যেন একই মুদ্রার এপাশ-ওপাশ।

সে-বিষয়ে আশ্বস্ত হলে একটু আগে যে-নেশা এসেছিল সে-নেশা কাটে। পরক্ষণেই তার মনে একটি প্রশ্ন আসে, কোথায় যাচ্ছে সে? উত্তরের জন্যে সে কাদেরের দিকে চোরা-দৃষ্টিতে একবার তাকায়। অভ্যাসবশত বাঁ-হাত স্থির রেখে ডান-হাত সজোরে দুলিয়ে তার সঙ্গী পূর্ববৎ দ্রুতপায়ে হাঁটে, দৃষ্টি সামনের পথে নিবদ্ধ। সে জানে কোথায় সে যাচ্ছে।

শীঘ্র যুবক শিক্ষক নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করে। একটা নিদারুণ বেদনায় বার-বার ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। অকারণেই যেন কতগুলি অর্থহীন ঘরোয়া চিত্র তার মনের পর্দার ওপর দিয়ে ভেসে যায়। তার গ্রামের মুদির দোকানের ফেনি বাতাসা, ঘরের পেছনে শেওলাপড়া ছায়াচ্ছন্ন পুকুর, পড়শীর নূতন বেড়া। তার বর্তমান যাত্রার পরিণাম তার কাছে প্রত্যক্ষগোচর হয় না বলে হয়তো তার ভীত মন পশ্চাতের পরিচিত স্থানে খুঁটি গাড়তে চায়। অথবা যা সে পেছনে ফেলে যাচ্ছে তার মূল্য নিরূপণ করবার চেষ্টা করে। হয়তো এখনো ফিরবার সময় আছে। যা সে ফেলে যাচ্ছে তার সে মূল্য জানে না কিন্তু সেখানেই তার প্রত্যাবর্তন করা উচিত। জীবনের মূল্য কি কেউ কখনো সঠিকভাবে বুঝতে পারে? মানুষ সর্বদা, জ্ঞাতসারে বা

BanglaBook.org

অজ্ঞাতসারে, জীবনের মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করে কিন্তু সক্ষম হয় কি? কী দিয়ে ওজন করে তুলনা করে? স্বর্ণকারের নিক্তিতেও তার মূল্য যাচাই করা যায় না। তার মূল্য নিরূপণের কোনো মানদণ্ড নাই।

যুবক শিক্ষক কাদেরের দ্রুতগতিতে তাল দিয়ে চলে কিন্তু তার সঙ্গীর সাবলীলতা নাই তার পদক্ষেপে। কাদের জানে যাত্রার কারণ, সে জানে না। অর্ধ-নিমীলিত চোখেও কাদের সবকিছু দেখে, যা সে সম্পূর্ণ খোলা দৃষ্টিতেও দেখতে পায় না। কিন্তু দেখার কী আছে? না দেখাতেই নিরাপত্তা। শীঘ্র কল্পনায় সে শত-শত চোখ দেখে : হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, ক্ষেত-খামারে। তার বিশ্বাস হয়, সবারই চোখ আছে কিন্তু কেউ কিছু দেখে না। সবাই তাই অতল গহ্বরের প্রান্তে দাঁড়িয়েও নিরাপদ বোধ করে।

একটু পরে যুবক শিক্ষকের মনটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। চারধারে চাঁদের আলো ঝকঝক করে। না, সে দেখতে না পেলেও সামনে অতল গহ্বর নাই। পাশে কাদেরের নিঃশঙ্কচিত্তও সে যেন স্পর্শ করতে পারে।

তবু শীতের রাতেও তার কপালে ঘামের আভাস দেখা দেয়।

বাঁশঝাড়ে প্রবেশ করার আগে কাদের একবার থমকে দাঁড়ায়। শান্তভাবে এদিক-ওদিক তাকায়, পাশে যুবক শিক্ষক সম্বন্ধে সজ্ঞান বলে মনে হয় না। তারপর সে দৃঢ়পদে বাঁশঝাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। অপ্রশস্ত পথ, পাশাপাশি দুজন মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব নয়। একটি মানুষের গায়েও আঁচড়-খোঁচা লাগে। যুবক শিক্ষকও কাদেরের মতো এধার-ওধার তাকায়, কিন্তু কেন তাকায় তা সে নিজেই জানে না। তারপর পায়ে কেমন জড়তা বোধ করলে সে দাঁড়িয়েই থাকে। অনতিদূরে নদী দেখা যায়। নদীর বুকে কুয়াশা। বাঁশঝাড়ে কাদেরের আওয়াজ শোনা যায় কিন্তু সেদিকে কান দেয় না। সে যে নদীর বুকে কুয়াশা দেখতে পায় তাতেই সে সন্তুষ্ট। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে ঊরুর কাছে চুলকাতে শুরু করে এবং মনে হয় একবার হাই তুলবে।

বাঁশঝাড় থেকে কাদেরের অনুচ্চকণ্ঠ শোনা যায়।

"কোথায় আপনি?"

যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না। উত্তর দেবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু ভেতর থেকে উঠে এসেও উত্তরটা মাঝপথে কোথাও হারিয়ে যায়। তারপর কাদের আবার তাকে ডাকে। যুবক শিক্ষক কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকে? এবারও সে উত্তর দেয় না বটে কিন্তু ঝট্ করে বাঁশঝাড়ে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটা অবশ হয়ে ওঠে, চোখের সামনে নিবিড় অন্ধকারটিও আবার নাবে। আজও বাঁশঝাড়ে হাল্কা অন্ধকার, দেখতে চাইলে সব দেখা যায়, কিন্তু সে আর কিছুই দেখতে পায় না। একটি দুর্বোধ্য কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য আদেশে অন্ধের মতো সে এগিয়ে যায়।

তারপর বাঁশঝাড়ে সে কাদেরকে সাহায্য করে, কিন্তু কিছু না দেখে কিছু না অনুভব করে। সময় দীর্ঘ ঢেউয়ের মতো ধীরে-ধীরে বয়ে যায়, চোখের অন্ধকার আরো নিবিড় কালো হয়, তার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় শিল-পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাবধানতা সত্ত্বেও বাঁশঝাড়ে নানাবিধ শব্দ হয়, প্রভূত বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয়। যুবক শিক্ষক সে-সব শব্দের বা বাধাবিপত্তির কারণ বোঝে না, বোঝার তাগিদও বোধ করে না।

একবার কাদেরের কণ্ঠস্বর তার কর্ণগোচর হয়। অনুচ্চ কণ্ঠ, তবু সন্দেহ থাকে না যে যুবক শিক্ষককে সে তিরস্কার করে।

"শক্ত করে ধরেন না কেন?" সে বলে।

কী সে শক্ত করে ধরবে? তার হাতে দুই খণ্ড হিমশীতল কাঠ। কিন্তু নিজের হাত দুটিও কাঠের মতো প্রাণহীন মনে হয় তার কাছে। তবু যতটা পারে ততটা শক্ত করে ধরে।

আবার কাদেরের গলা কোত্থেকে ভেসে ওঠে। তখন কালোস্রোতে যুবক শিক্ষক ভাসছে।

BanglaBook.org

কাদেরের কণ্ঠ অনেক দূরে অজানা কোনো পানির জন্তুর মতো লাফিয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষক হিমশীতল কাঠ দুটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে।

"কোথায় যাচ্ছেন?" আবার কাদেরের গলা। কাছাকাছি কোথাও সে-গলা ঝনঝন করে ওঠে।

উত্তরে যুবক শিক্ষক ব্যথার অস্ফুট আওয়াজ করে, কারণ তার পশ্চাদ্ভাগে সূক্ষ্মাগ্র কিছু বিদ্ধ হয় যেন। ত্রস্তগতিতে অন্যদিকে মোড় নিলে বাঁশঝাড় তাকে সহস্র হস্ত দিয়ে আলিঙ্গন করে। ফলে বিদ্যুদ্বেগে একটি নিদারুণ ভয় তাকে এবার আঁকড়ে ধরে। তারপর সে-ভীতির জন্যেই হয়তো সে ক্ষণকালের জন্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। বাঁশে আলোয়ান আটকে গেছে। একহাতে মৃত নারীর পা-দুটি ধরে সে বিষম বেগে আলোয়ানটা ছাড়িয়ে নেয়। হিংস্র জন্তুর মুখগ্রাস থেকে সে যেন হাত ছিনিয়ে নেয়। সারা বাঁশঝাড় কেঁপে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত পরে অত্যাশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটে। হঠাৎ উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে যুবক শিক্ষকের মুখ ভেসে যায়। সে অবশেষে দীর্ঘ গুহা অতিক্রম করে আলোতে পৌঁছেছে। কিছুটা বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে কাদের তৎক্ষণাৎ ভর্ৎসনা করে ওঠে। কাতরকণ্ঠে যুবক শিক্ষক উত্তর দেয়, "কোন্ দিকে যাব?"

তারা নদীর দিকে চলতে শুরু করে। কাদের নির্বাক। দূরে গ্রামে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে, কোথাও একটা রাত-জাগা-পাখি নিঃসঙ্গ কণ্ঠে ডেকে ওঠে। যুবক শিক্ষকের মুখ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে। অতি নিকটে পরিচিত আওয়াজ শুনতে পেলে প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হয়, তারপর বোঝে সে-আওয়াজ তাদের উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের। তার মনে হয়, তারা যেন বিক্রয়সামগ্রী নিয়ে হাট-বাজার অভিমুখে ধাবমান দুটি মানুষ, দিগন্তে সকালের তির্যক সূর্যালোক। তারা হাঁপাচ্ছে। পথে অশেষ ধুলা।

নদীর খাড়া পাড় দিয়ে নাবতে শুরু করে যুবক শিক্ষক ভয়ে নিথর হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, সে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। নিচে আবার অতল গহ্বর।

"কী হল?" কাদের অনুচ্চকণ্ঠে হুমকি দিয়ে ওঠে।

যুবক শিক্ষক চোখ খুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাতর-স্বরে বলে, "কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

কিন্তু অতল গহ্বরের প্রান্তে চোখ আপনা থেকেই খোলে। অবশেষে অসীম শক্তি প্রয়োগ করে যুবক শিক্ষক তার দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। খাড়া পাড় অত খাড়া নয়। অদূরে একটু সমতল স্থানের পর পানি অস্ফুট শব্দে ছলছল করে। তারপর সে মুখটি দেখে। কাদের তার মুখ ঢেকে দিয়েছিল কিন্তু এক সময়ে আঁচলটি সরে গেছে! তার উন্মুক্ত মুখে চাঁদের পূর্ণ আলো।

নিচে নেবে যুবক শিক্ষক এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চাপাস্বরে কাদের আবার ভর্ৎসনা করলে সে উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। দেহে একবিন্দু শক্তি আর নাই। হাড়-মাংস গলে নিঃশেষ হয়ে গেছে! যুবক শিক্ষক আর ওঠে না। কাদেরের ভর্ৎসনায় কানও দেয় না।

কিছুক্ষণ পরে একাকী কাজ শেষ করে কাদের যখন নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন তার কিছু সম্বিত ফিরেছে। সে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থেকে তার কণ্ঠস্বরের জন্যে অপেক্ষা করে। কাদের কিছু না বললে সে ধীরে-ধীরে উঠে বসে। তারপর একবার এক পলকের জন্যে মুখ তুলে তাকায় তার দিকে। কোমর পর্যন্ত তার কাপড় ভিজে জবজব করছে। সে তার দিকে তাকিয়ে আছে বলে তার মুখটা অন্ধকারে ঢাকা। তারপর অস্পষ্টভাবে তার চোখ সে দেখতে পায়। সে-চোখে যেন পরম ঘৃণার ভাব। কাদেরের পায়ের তলে সে যেন ঘৃণ্য বস্তু, শিরদাঁড়াহীন নপুংশক কীটপতঙ্গ কিছু।

যুবক শিক্ষক মন্থরগতিতে প্রবাহিত শীতের শীর্ণ নদীর দিকে তাকায়। জ্যোৎস্না তার বুকে রূপালি আলোয় ঝলমল করে। এখন তাতে কুয়াশার কোনো চিহ্ন নাই। সত্যিই সে কি কুয়াশা দেখেছিল? নদীর বুকে কিছুই নাই। একবার দূরে একটা শিশুক মাছ ভেসে উঠে পরক্ষণেই

BanglaBook.org

আবার ডুবে যায়। ওপারে শুভ্র কাশবন স্বপ্নের মতো বিস্তারিত হয়ে ধবধব করে। পানির অস্ফুট কলতান ছাড়া চারধারে প্রগাঢ় নীরবতা।

একটু পরে কাদের নিঃশব্দে সরে গিয়ে পাড় বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। যুবক শিক্ষক মুখ ফিরিয়ে দেখে, কাদের নাই। কোনো কথা না বলে সে চলে গেছে। কোনো কথা, কোনো ব্যাখ্যার যেন প্রয়োজন ছিল না। শূন্য পাড়ের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক কতক্ষণ হতবাক হয়ে বসে থাকে। তারপর কোথেকে একটা ক্রোধ এসে তার সারা মন ভরে দেয়। সে-ক্রোধের কারণ না বুঝলেও তার সন্দেহ থাকে না যে, ক্রোধটা ন্যায্য। তারপর এক সময় সে-ক্রোধ নিঃশেষ হয়ে গেলে সে অতিশয় নিঃসঙ্গ বোধ করে।

পাড় বেয়ে ওঠার আগে যুবক শিক্ষক শেষবারের মতো নদীর বুকে দেহটাকে খুঁজে দেখে : কিন্তু কোথাও তার চিহ্ন নাই। তারপর একটি অপ্রীতিকর কথা স্মরণ হলে সে পানির ধারে গিয়ে কাদা মেখে প্রবলভাবে হাত সাফ করে। সে-কাজ সম্পন্ন হলে সে আলোয়ানটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে তীরে উঠে বাড়ি অভিমুখে রওনা হয়।

নদীর শূন্য বুকের মতো তার বুকও শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে।

পাঁচ

একচোখ-কানা মুয়াজ্জিনের তীক্ষ্ণ-কর্কশ কণ্ঠে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন, প্রতিবার একটু চমকে উঠতেই হয়। দাদাসাহেব অবশ্য তাতে অনেক ফায়দা দেখেন। কেউ একবার নালিশ করলে তার লম্বা ফর্দ দিয়েছিলেন। লোকটির জাঁদরেল কণ্ঠ আজানের আসল উদ্দেশ্য তো জোরদারভাবে হাসিল করেই, তাছাড়া শয়তান বিতাড়িত করে, অলস মনকে ধর্মতত্ত্বে সক্রিয় করে। কণ্ঠে মাধুর্যের অভাব আছে বৈকি কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে মাধুর্যের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। হৃৎপিণ্ডদুর্বল মানুষের ক্ষতি হতে পারে? অতিশয় গম্ভীর হয়ে দাদাসাহেব উত্তর দেন, অন্তিম-মুহূর্তে খোদার নাম কানে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। অবশ্য মুয়াজ্জিনটি যে তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র সে-কথা তিনি বলেন না। সে-কথা মুখে বলা যায় না। কারো নিঃস্ব দারিদ্র্য স্নেহের কারণ সে-কথা বলতে মুখে বাধে। তবে তাঁর একটা বিশ্বাস একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। এ-দরিদ্র দেশেও দারিদ্র্যের ব্যাপারে তার সমকক্ষ কেউ নাকি নাই। কথাটা মনে পড়তেই যুবক শিক্ষকের একটু হাসি পায়। তারপর খোলা দরজা দিয়ে সূর্যাস্তের কত বাকি তা একবার লক্ষ্য করে দেখে সে স্থির হয়ে বসে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরের জন্যে অপেক্ষা করে। আজানের জন্যে মনে অধীরতা বোধ করলেও সবকিছু তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। পৃথিবী আবার স্বরূপ ধারণ করেছে।

সমস্ত দিন যুবক শিক্ষকের গতানুগতিক জীবনযাত্রার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই, সকালে বড়বাড়িতে বা ইস্কুলে শিক্ষকতার কাজেও কোথাও ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু অভ্যাসবশতই সে যে নিত্যকার কর্তব্যপালন করেছে তা নয়। বরঞ্চ তার গতানুগতিক জীবনযাত্রা সে রক্ষাবরণ হিসাবেই ব্যবহার করেছে। বিপদ আশঙ্কা করলে শামুক যেমন খোসার মধ্যে নিরাপদ বোধ করে তেমনি সে তার জীবনযাত্রার মধ্যেই নিরাপদ বোধ করেছে। কর্তব্যপালন কষ্টসাধ্য মনে হয়েছে কিন্তু তাতে কোথাও যাতে স্খলন না হয় তার জন্যে তার সাবধানতার শেষ থাকে নাই। প্রথম রাতে অতিশয় ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়লেও সে চিন্তাশক্তি হারায় নাই। কিন্তু গতরাতে নদী থেকে ফিরবার সময় তার মনে হয়, তার চিন্তাশক্তি সত্যিই যেন লোপ পেয়েছে। কেবল সে বোঝে, তার কিছুই করার নাই, শুধু অপেক্ষাই করতে পারে। হয়তো কোথাও কিছু ঘটবে, কোথাও একটা আলো দেখতে পাবে, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মর্মার্থ বুঝতে পারবে। কিন্তু কিছুই ঘটে নাই।

তারপর এক সময়ে ক্ষুধার্ত শামুকের মতো পরিণামভয়শূন্য হয়ে খোসা ছেড়ে সে

BanglaBook.org

ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসে। তখন অপরাহ্ণ। ইস্কুল থেকে ফিরে সে বড়বাড়ির ছাতাপড়া বিবর্ণ সম্মুখভাগের দিকে তাকিয়ে দেখে, কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। দাদাসাহেবকে দেখতে না পেলেও সে যেন তাঁর শান্ত-সৌম্য চেহারা দেখতে পায়। তাঁর চেহারা মনে পড়তে সে কেমন সাহস পায়। বড়বাড়ির সামনে সুপরিচিত উঠানটি শীতের শুষ্কতায় খটখট করে। সে-উঠানও তাকে আশ্বস্ত করে।

হঠাৎ সে বুঝতে পারে, তার ভয়ের কারণ নাই। যে-বিচিত্র অভিজ্ঞতার অর্থ সে জানে না, সে-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে জড়িত বোধ হলেও আসলে সে জড়িত নয়। শুধু সে নয়, কাদেরও তার সঙ্গে জড়িত নয়। তারপর অকস্মাৎ তার মনে নানাপ্রকার প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। খই ফোটার মতো, একটির পর একটি। সারাদিন যে-মন স্তব্ধ হয়েছিল, সে-মনে প্রশ্নের এ-বিস্ফোরণে সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। তবে নৈর্ব্যক্তিক দর্শকের যে-পরম স্বস্তিভাব সে বোধ করে, সে-স্বস্তিভাব আরো গাঢ় হতে থাকে।

মনে আর ভয় নাই কিন্তু অন্ধকার আছে। সে-অন্ধকার কাটাবার জন্যে যুবক শিক্ষক তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করে। সে বুঝতে পারে, কাদেরই সে-অন্ধকার দূর করতে পারবে।

মনে ভয় নাই কিন্তু অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলতা। সে-অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলতাও কাদের দূর করতে পারে। কাদেরের সঙ্গে শীঘ্র দেখা করা তার অতি প্রয়োজন।

বড়বাড়ির লম্বা বারান্দায় প্রতিদিন পারিবারিক জমায়েতে মগরেবের নামাজ হয়। তাতে যুবক শিক্ষক নিত্য যোগদান করে। মতিগতি ভালো হলে কাদেরও আসে। যুবক শিক্ষকের মনে আশা হয়, আজ হয়তো কাদের সান্ধ্যনামাজে আসবে। সূর্যাস্তের সন্নিধানে তার সঙ্গে দেখা করার বাসনাটি কেমন সহ্যাতীতভাবে তীব্র হয়ে ওঠে।

কী সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে? মনে প্রশ্নের যেন শেষ নাই। তার কোনটা সে জিজ্ঞাসা করবে, কোনটার উত্তর পেলে সে শান্তি পাবে? অস্থিরভাবে সে প্রশ্নগুলি ছাঁটাই-বাছাই করে, যে-গুলো অতি প্রয়োজনীয় মনে হয় সে-গুলো পরিপাটিভাবে সাজাবার চেষ্টা করে।

যুবক শিক্ষকের মনে সন্দেহ থাকে না যে, প্রথম রাতে কাদের কেন মাঠে-ঘাটে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে-কথাই তাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রত্যুত্তরে কাদেরও তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, সে-ই বা কেন শীতের গভীর রাতে বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর দিতে সে প্রস্তুত। সে দ্বিধা না করে স্বীকার করবে, কাদেরকেই সে অনুসরণ করছিল। তাকে হারিয়ে ফেলার পর সে ঘরে ফিরে যায় নাই কেন সে-কথা কাদের জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে সত্য কথা, কাদের বিশ্বাস না করলেও বলবে কী কারণে সে ঘরে ফিরে যায় নাই। জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতের প্রতি তার গোপন নেশার কথা বলতে হয়তো কিছু লজ্জা হবে, কিন্তু সে-কথা ঢেকে রাখা সম্ভব হবে না। সে যদি নিজেই সত্য কথা না বলে তবে কাদেরকে কোনো প্রশ্ন করার বা তার কাছ থেকে সত্য উত্তর দাবি করার অধিকার তার থাকবে না। তাছাড়া, সত্যই সত্যকে আকর্ষণ করে।

একটা কথায় যুবক শিক্ষকের মনে শীঘ্র খটকা লাগে। কেন সে কাদেরকে তার ভ্রমণের কথাটি প্রথম জিজ্ঞাসা করতে চায়? একটি বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ : যুবতী নারীর মৃত্যুর সঙ্গে কাদেরের কোনো সম্বন্ধ নাই। সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করত না, তার মনে হঠাৎ মেঘ কেটে আলোও প্রকাশ পেত না। বস্তুত, তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও সে দেখত না। তবে কেন সে প্রশ্নটি তার প্রশ্নতালিকার শীর্ষে বসিয়েছে? অবিশ্বাস সত্ত্বেও সে কি বিশ্বাস করে কাদের দরবেশ? সে-কথাই কি সে প্রথম যাচাই করে নিতে চায়?

খটকাটা যায় না। সে যে কাদেরকে তার বাল-সুলভ ভাতিকটির কথা বলতে প্রস্তুত তাতেও সে নিজেই নিজের মনে একটা গূঢ় অভিসন্ধি দেখতে পায়। হয়তো তার গোপন বাসনা

এই যে, হোক তাদের রাতভ্রমণের উদ্দেশ্য ভিন্ন, তবু সে তার মনের গোপন বাতিকটির কথা প্রকাশ করলে পরস্পরের মধ্যে একটি মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সে যেন তার অভিজ্ঞতার অর্থ বোঝার চেয়ে কাদেরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অনেক ভেবেও যুবক শিক্ষকের মনের খটকা যায় না। কেবল এ-কথা সে বোঝে, প্রশ্নটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেন তার উত্তরের ওপরেই অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে। যেন সে-প্রশ্নের উত্তরের পরেই সে বুঝতে পারবে কাদের তার মনের অশান্তি-বিশৃঙ্খলতা এবং তার মনের অন্ধকার দূর করতে পারবে কি পারবে না। শুধু অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর নয়, সে-প্রশ্নের উত্তর কাদেরের মনের পরিচয়ও দেবে। কাদেরকে না বুঝতে পারলে বিচিত্র অভিজ্ঞতাটির রহস্য মোচন হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : কাদের কি যুবক শিক্ষককে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেছিল?

ঘটনাটি সে কাদেরের দৃষ্টিতে ভেবে দেখে। প্রথম রাতে কাদের তাকে বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। দু-জনে মুখামুখি হলে যুবক শিক্ষক হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায়। তখন কৌতূহলী হয়ে কাদের বাঁশঝাড়ে প্রবেশ করলে মৃতদেহটি দেখতে পায়। তারপর যুবক শিক্ষককে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করাই তার জন্যে স্বাভাবিক নয় কি?

এখানে যুবক শিক্ষক একটু ইতস্তত করে। সে বুঝতে পারে না, ভূমিকা না দিয়েই প্রশ্নটি করা সমীচীন হবে কিনা। একটি সন্দেহের কথা বলে অন্য একটি সন্দেহের কথা চাপা দিয়ে রাখলে হয়তো প্রশ্নটি কাদেরের কাছে অসম্পূর্ণ মনে হবে। হয়তো তখন তার মনে এই সন্দেহের সৃষ্টি হবে যে, যুবক শিক্ষকের মনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে বলেই সব কথা সে খুলে বলছে না। তখন কাদেরও মন খুলে সব কথা বলবে না বা তাকে সাহায্য করতে চাইবে না।

একটু ভেবে যুবক শিক্ষক স্থির করে, ভূমিকাটি না বলে প্রশ্নটি সে করতে পারবে না। এক হাতে সত্য দিয়ে অন্য হাতে সত্য নেবে।

কাদের সম্বন্ধে তার সন্দেহই সে-ভূমিকার বিষয়বস্তু। বাঁশঝাড়ে বীভৎস দৃশ্যটি দেখে বেরিয়ে আসার পর কাদেরের সঙ্গে মুখামুখি হলে হঠাৎ তার মস্তিষ্কবিভ্রান্তি ঘটে : তার চোখে কাদেরই নিষ্ঠুর-নির্মম হত্যাকারীর রূপে আবির্ভূত হয়। তাই সে হঠাৎ একটি নিদারুণ ভয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। কাদেরই যে হত্যাকারী, সে-ধারণা পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত তার মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে।

এখানে যে-একটা প্রশ্ন উঠতে পারে সে-কথা যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে। তেমন ধারণাই যদি থাকে তবে পুলিশকে সে খবর দেয় নাই কেন, কাউকে কিছু বলে নাই কেন? প্রশ্নটি মনে জাগতেই যুবক শিক্ষক অবিলম্বে তার যথার্থতা স্বীকার করে। সে-প্রশ্ন কাদের না করলে অন্য কেউ করবে।

একটা উত্তর ঝট্ করে মাথায় আসে। কী করে সে পুলিশকে খবর দেয়? সে বড়বাড়ির আশ্রিত মানুষ, এবং কাদের বড়বাড়িরই লোক। তার পক্ষে কথাটা প্রকাশ করা কি সহজ? উত্তরটা কিন্তু তার পছন্দ হয় না। তাতে কেমন দুর্বলচিত্ত স্বার্থপরতার ছাপ। না, বড়বাড়ির আশ্রয়টি অত্যন্ত লোভজনক বটে কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। আসল কারণ বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বি দাদাসাহেবের প্রতি তার গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা। কাদের যে তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র সে-কথা সে জানে। দাদাসাহেবের প্রতি তার যখন এত ভক্তিশ্রদ্ধা তখন কী করে তাঁরই প্রিয়পাত্রের ক্ষতি করতে সে ছুটে যায়?

এ-উত্তরেও যুবক শিক্ষক সন্তুষ্ট হয় না। তারপর হঠাৎ একটি কথা উপলব্ধি করে সে সামান্য বিহ্বল হয়েই পড়ে। প্রশ্নকার যেন উত্তরদাতায় পরিণত হয়েছে। আকস্মিক স্থান পরিবর্তনের ফলে মনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে সে ঘটনার অনুক্রম মিশিয়ে ফেলছে, যে-কথা ভাবে নাই সে-কথা ভেবেছে বলে কল্পনা করছে, সম্ভাব্য কিন্তু ঘটে নাই এমন সব কথা তুলছে। আসল সত্য কী? আসল সত্য এই যে, মস্তিষ্কবিভ্রান্তির জন্যে কথাটা

BanglaBook.org

কাউকে বলার খেয়াল তার মাথায় আসে নাই।

সেটাই কি সত্য, সম্পূর্ণ সত্য?

না, আরেকটি কথা আছে যা হয়তো সে কাদেরকে কেন, কাউকে বলতে পারবে না। তার মনে হয়েছিল, বাঁশঝাড়ের কথাটি প্রকাশ করা যায় না। সে-টি কাদের আর তার মনের গোপন কথা। শরীরের গোপন স্থানে গুপ্তক্ষতের মতো। এমন কথা কাউকে বলা যায় না।

ক্ষণকালের জন্যে একটি অজানা অন্তর্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যুবক শিক্ষক। সে-ভাবাবেগ কাটলে সে গভীর নিঃসহায়তার সঙ্গে ভাবে, সে অল্পবয়সী দরিদ্র শিক্ষক, বাঁশঝাড়ে নিহত মানুষের মৃতদেহ কখনো দেখে নাই। তার যে মস্তিষ্কবিভ্রান্তি ঘটবে তাতে বিস্ময় কী? সে কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না। চতুর্দিকে যে-অন্তহীন রহস্য সে অনুভব করে তার কতটা সে বোঝে? সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, উদ্ভিদ-তরুলতা, নদীপ্রবাহ, মানুষের হাসিকান্না-দুঃখকষ্ট, তার জন্মমৃত্যু : এ-সবের অর্থ কি সে বোঝে? সে-জন্যেই সে একটি মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন এমন তীব্রভাবে বোধ করছে।

কাদের যে হত্যাকারী সে-ধারণা কী করে যায়? যে-ধারণা পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত তাকে ভীত-নিপীড়িত করেছে, সে-ধারণা থেকে কোন যুক্তি-সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে সে মুক্তিলাভ করে?

এ-প্রশ্নেও যুবক শিক্ষক ঠক্কর খায়। কিন্তু এ-প্রশ্নের কি কোনো বোধগম্য উত্তর আছে? সবই বিশ্বাস। দোষী, সেটাও বিশ্বাস; নির্দোষ, সেটাও বিশ্বাস। বিশ্বাসের ওপরই কি সমগ্র মানবজীবন নির্ভর করে নাই? বিশ্বাস যে, কাল সূর্যোদয় হবে, পাখিরা আবার গান করবে। বিশ্বাস যে আজকার পাড়-অবরুদ্ধ নদী কাল প্লাবিত হবে না। বিশ্বাস যে এবার ফসল হল না, বৃক্ষে ফল ধরল না, আগামী বছর ফসল হবে ফল ধরবে। বিশ্বাস যে অলব্ধ সুখও কোথাও সীমাহীন এবং নিশ্চিত, অনলবর্ষী দুঃখ-যন্ত্রণার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে একদিন, এ-জীবনে না হলেও পরবর্তী জীবনে। বিশ্বাস যে, মনের গভীর অস্থিরতার উত্তর না পেলেও ভাবনা কী, কারণ কেউ কোথাও সে-মনের রক্ষক-অভিভাবক। সবই বিশ্বাস, জীবনের একমাত্র সম্বল। কাদেরের ক্ষেত্রে তার মনে কেবল এক বিশ্বাস ভাঙে, অন্য বিশ্বাস গড়ে।

এ-উত্তরই কি যথেষ্ট? সব বিশ্বাসেরই কোনো-না-কোনো হেতু থাকে। জীবনের একমাত্র অবলম্বন হোক, তবু তার মধ্যে একটা যুক্তির কাঠামো থাকে।

না, তার এ-বিশ্বাসের কোনোই যুক্তি নাই। সে কেবল জানে, এমন কথা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। পরদিন দুপুরে অন্ধ ভয় কাটলে সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, তা অসম্ভব। দুনিয়াতে নিষ্ঠুরতা পাপ-কলুষতা আছে সে জানে এবং তার প্রমাণ বাঁশঝাড়ের মৃতদেহটি। কিন্তু তা সর্বত্র ছড়িয়ে নাই, আগাছার মতো সর্বত্র জন্মায়ও না তা। তা যদি হত তবে মানুষে-মানুষে বিশ্বাস সম্ভব হত না, জীবন দুর্বিষহ হত। বস্তুতপক্ষে, তাহলে জীবনের কোনোই অর্থ থাকত না।

তারপর তৃতীয় প্রশ্ন : সে-রাতে কাদের তার ঘরে কেন এসেছিল? যুবক শিক্ষকই হত্যাকারী কিনা সে-কথা নিশ্চয় করে দেখার উদ্দেশ্যে কি? বা গভীর রাতে একটি অসহায় মৃতদেহ দেখে মনে পরম নিঃসঙ্গতা বোধ করলে সঙ্গলিপ্সা সান্ত্বনা-আশ্বাসের জন্যে?

যুবক শিক্ষকের বিশ্বাস, সে হত্যাকারী কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে কাদের আসে নাই। যুবক শিক্ষকের মতোই তারও মনে মানুষের উপর আস্থা না থাকার কারণ নাই। তাছাড়া সে যে যুবক শিক্ষককে সন্দেহ করে নাই তার প্রমাণ সে-ও পুলিশকে বা কাউকে কিছু বলে নাই।

দ্বিতীয় রাতের ঘটনার বিষয়ে একটি প্রশ্ন যুবক শিক্ষকের কাছে জরুরি মনে হয়। যুবতী নারীর মৃতদেহটিকে গুম করে দেবার অত্যাশ্চর্য সিদ্ধান্তের কারণ কী?

উত্তরটি যুবক শিক্ষক ভাসা-ভাসা দেখতে পায়।

BanglaBook.org

বাঁশঝাড়ে মৃতদেহটি আবিষ্কার করার পরদিন নির্বাক-নিদ্রালস কাদেরও সমস্তক্ষণ কান খাড়া করে রাখে। রাত হলে সে বোঝে, বাঁশঝাড়ের গুপ্তকথা কেউ জানতে পারে নাই। হয়তো তার অন্তর্ধানে তার আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময়ের অবধি থাকে নাই। হয়তো নানাবিধ কারণ তাদের মাথায় আসে। কিন্তু সে যে গ্রামের প্রান্তেই বাঁশঝাড়ের মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত সে-কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না।

কাদের সাব্যস্ত করে, যুবতী নারীর মৃতদেহটি গুম করে দেবে। কেন? হয়তো সে ভাবে, হতভাগা নারীর পক্ষে বাঁশঝাড়ে অর্ধনগ্ন অবস্থায় আবিষ্কৃত হবার চেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই শ্রেয় হবে। হয়তো তার জীবনে সুখশান্তি অর্থ-সম্পদ স্নেহ-ভালোবাসার মান-মর্যাদার সৌভাগ্য হয় নাই। তার মৃত্যুও কি এমন কুৎসিতভাবে ঘটবে? সে যদি তাকে এই গভীর অপমান থেকে বাঁচাতে পারে তবে অন্ততপক্ষে প্রাণান্তের পর তার একটু সাহায্য হবে। তাতে তার আত্মীয়-স্বজনের কোনো ক্ষতি হবে না। যাকে তারা হারিয়েছে তাকে আর ফিরে পাবে না। বরঞ্চ তার অন্তর্ধানে তাদের মনে রহস্যের সৃষ্টি হবে। সে-রহস্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা হয়তো তার মৃত্যু সম্বন্ধে সুন্দর রূপকথা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হবে। হতভাগা যুবতী নারী অবশেষে স্বপ্নাকাশের অম্লানকুসুমে পরিণত হবে।

এখানে একটি কথা যুবক শিক্ষক ভালো করে বোঝে না। যুবতী নারীর যে প্রাণ নিয়েছে তার শাস্তির কথা কি কাদের ভাবে নাই? দেহ গুম করে দিয়ে সে খুনীর অপরাধও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তার শাস্তির চেয়ে যুবতী নারীর মান-মর্যাদাই কি তার কাছে বড় ঠেকেছে? অথবা তার মত এই কি যে, মানুষের অপরাধ মানুষের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়, তাই তার অপরাধের প্রমাণ—যা কেবল অর্থহীন আবর্জনা মাত্র—তা অদৃশ্য হয়ে গেলে ক্ষতি কী? যুবক শিক্ষক ঠিক করে, এ-বিষয়েও কাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে।

একা মানুষের পক্ষে একটি মৃতদেহ নদীতে বহন করে নিয়ে যাওয়া শুধু যে বিপজ্জনক তা নয়, অতি কষ্টসাধ্যও। কাদের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে। কার সাহায্য চাইবে সে?

অতএব পঞ্চম প্রশ্ন : সাহায্যের জন্যে কাদের তারই কাছে কেন আসে? প্রথম রাতে সে কি তার দুর্বল নির্বোধ চরিত্রের যথেষ্ট প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে নাই? তারপর মানুষের ওপর নির্ভর করার কথা কী করে সে ভাবতে পারে?

হয়তো ওসব কিছু নয়। কাদেরের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে যুবক শিক্ষকই হত্যাকারী। অতএব সে স্থির করে যে, যে মানুষ যুবতী নারীকে হত্যা করেছে তাকে বাধ্য করবে যুবতী নারীকে শেষ অপমান থেকে রক্ষা করার জন্যে।

অথবা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দু-জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে কাদেরের মনে যুবক শিক্ষকের প্রতি কেমন একটা বন্ধুত্বের ভাব জাগে। তাই দ্বিতীয় রাতে স্বাভাবিকভাবে সে তারই দরজায় এসে হাজির হয়।

শ্রান্তভাবে যুবক শিক্ষক আপন মনে স্বীকার করে, তার চারধারে ঘোর অন্ধকার, যে-অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মতোই সে প্রশ্নগুলি তৈরি করেছে। তবে তার সন্দেহ থাকে না যে, একবার কাদেরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবার সুযোগ পেলে সব অন্ধকার দূর হবে। এমন অন্ধকার জীবনে কখনো সে দেখে নাই, অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের জন্যে এমন তীব্র ব্যাকুলতাও কখনো বোধ করে নাই।

অবশেষে মুয়াজ্জিনের তীক্ষ্ণ-কর্কশ কণ্ঠ সন্ধ্যাকাশ খণ্ডবিখণ্ড করে ফেটে পড়ে। একটু পরে যুবক শিক্ষক ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। নিত্যকার মতো তার শীর্ণমুখ গম্ভীর। তবে আজ তার পদক্ষেপে লঘু চঞ্চলতা।

নামাজের সময় কাদের দেখা দেয় নাই। বারান্দার কোণে ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসে যুবক শিক্ষক কতক্ষণ শ্বসনক্রিয়ারহিত অবস্থায় থেকে হঠাৎ সজোরে নিশ্বাস নেয়। তারপর এক সময়ে তার মনে হয় অতি ক্ষুদ্র কণ্ঠে আনিশা কিছু বলছে।

BanglaBook.org

"কী?"

কিন্তু সে ভাবে, কাদেরের বিবেকে দোষ-জ্ঞান নাই। হয়তো ইতিমধ্যে দুই রাতের বিচিত্র নাটকের কথা সে ভুলে গেছে। যুবক শিক্ষকের বিবেকও পরিচ্ছন্ন। সে ভোলে না কেন?

বইতে এক জায়গায় আনিশা আঙুল দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট উল্টায়। যুবক শিক্ষক আবার বলে, "কী?"

তারপর নীরব বারান্দায় মস্ত দেয়ালঘড়ির টক্‌টক্‌ আওয়াজ শোনা যায়। ওপর থেকে দাদাসাহেবের খড়মের আওয়াজ আসে। অবশেষে যুবক শিক্ষক বলে, "শক্ত কেন হবে? পশ্চাদাভিমুখে।"

আনিশা ঠোঁট উল্টায় আবার। অকারণে যুবক শিক্ষক এধারে-ওধারে তাকায়। বড়বাড়িতে এখন গভীর নীরবতা। বাইরে শীতের রাত ঝিম্‌ ধরে আছে। কেশে যুবক শিক্ষক আবার বলে, "পশ্চাদাভিমুখে।"

হয়তো কাদেরের মতে কর্তব্য শেষ হয়েছে। নদীর বুকে যে আশ্রয় নিয়েছে সে আর দেখা দেবে না। তার আর কিছুই করবার নাই।

কাদেরের সঙ্গে তার যদি আর দেখা না-ই হয়? দু-বছর একই বাড়িতে বাস করেও যার সঙ্গে কথার আদান-প্রদান হয় নাই, তার সঙ্গে আবার কথা বলার সুযোগ না হওয়াই স্বাভাবিক।

শীঘ্র আনিশা বসে-বসে ঝিমুতে শুরু করে। পাশে আমজাদ লাইনকাটা খাতায় সযত্নে কতগুলি অঙ্কের সংখ্যা সাজায়। যুবক শিক্ষক তাদের আর দেখে না। একনাগাড়ে একই ভঙ্গিতে বসে থাকার ফলে তার পায়ের গাঁটে কেমন কাঠ-কাঠ ভাব জাগে বলে সে নড়ে বসে। তারপর কুদ্দুসের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে, "তোমাদের কাদের দাদা কোথায়?"

তিনটি ছেলে মুখ তুলে তাকায়। তাদের চোখে ঘুম-ঘুম ভাব। অকারণে তারা এধার-ওধার দৃষ্টি দেয়। অবশেষে ভারি গলায় কুদ্দুস উত্তর দেয়, "কী জানি।"

"ঘরে হবে।" আরেকজন বলে।

এই সুযোগে তৃতীয় ছেলেটি অদূরে আধা-খোলা জানলার দিকে তাকায়। এখনো চাঁদ ওঠে নাই বলে বাইরে অন্ধকার। অন্ধকারকে তার ভয়।

আবার নীরবতা নাবলে যুবক শিক্ষকের কাছে এবার হঠাৎ সবকিছু এমন অসত্য এবং অবাস্তব মনে হতে শুরু করে। সে ভাবটি কাটাবার জন্যেই হয়তো সে সজোরে নিশ্বাস নেয়, তার নাসারন্ধ্র কেঁপে ওঠে। তারপর তার ভয় হয়, দিনের মানসিক অবস্থাটি ফিরে আসছে যেন। সে আবার এমন একটি গুহায় প্রবেশ করছে যেখানে জন-মানব পশু-পক্ষীর আওয়াজ পৌঁছায় না। তখন বাইরে যেন জীবনের অবসান ঘটে, সারা পৃথিবী নির্জনতায় খাঁখাঁ করে।

অবশেষে সেদিন শেষবারের মতো একচোখ-কানা মুয়াজ্জিনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। চমকিত হয়ে যুবক শিক্ষক সামনের বইখাতা বন্ধ করে, কর্কশ কণ্ঠস্বরে কেমন আশ্বস্ত বোধ করে। মানুষের কর্কশ কণ্ঠও সান্ত্বনাদায়ক। তাছাড়া, যা সে শোনে তা যেন মানুষের আদিম সতর্কবাণী। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে প্রহরী জেগে আছে জানলে ভীতির উপশম হয়।

উঠবার আগে যুবক শিক্ষক কুদ্দুসের দিকে একবার তাকায়। কাদেরকে ডেকে পাঠাবে কি?

কিন্তু কিছু না বলে সে নীরবে বারান্দা ত্যাগ করে।

BanglaBook.org

ছয়

প্রধান শিক্ষকের কামরার পাশে শিক্ষকদের বিশ্রামঘর। অসমতল মেঝের মধ্যখানে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল। তার চারপাশে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা কুর্সি। তবে একটি কুর্সির ওপর সর্বদা সকলের নজর। বুনটের ফাঁকে-ফাঁকে সংখ্যাতীত পুষ্টাঙ্গ ছারপোকা, তবু সেটি বেতের তৈরি বলে আরামদায়ক। পিঠটা একটু হেলানো, দু-পাশে হাতলও আছে। আরামের

বিনিময়ে রক্ত দিতে কেউ দ্বিধা করে না। আজ সে-কুর্সিতে আরবির শিক্ষক মোহাম্মদ আল্‌ফাজউদ্দীন এক হাঁটু তুলে আসনাধীন। মুখে সচেতন আয়েশী ভাব।

টিফিনের সময় শিক্ষকরা গাম্ভীর্য-কর্তৃত্বের মুখোশ খুলে প্রায় ছাত্রদের মতোই হট্টগোল করে। খবরাখবরের আদান-প্রদান করে, নানা বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামতের ঢাকঢোল বাজায়, শ্রোতা না পেলেও কেউ-না-কেউ শুনবে এ-আশায় একতরফা বকে যায়। না শুনলেও পরওয়া নাই যেন। বিশ্রামঘরে শ্রোতারা সব সময়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ।

অভ্যাসমতো যুবক শিক্ষক এককোণে নির্বাক হয়ে বসে। সামনে একটি পুরোনো মাসিক পত্রিকা। সেটি পড়ার ভান করে। সহযোগীদের কথা কখনো-কখনো কানে লাগে, কিন্তু তাও ভাসা-ভাসা ভাবে। তার কানের সীমানায় ধরবার কিছু না পেয়ে তাদের কথা পিছলে খসে যায়। কিছুক্ষণ সময় কাটে। যুবক শিক্ষক পাতা ওল্টায় না।

এক সময়ে কোলাহলের মধ্য থেকে একটি শব্দ ছিটকে বেরিয়ে আসে। তারপর, অব্যর্থলক্ষ্য শব্দটি সরাসরি চাঁদমারি বিদ্ধ করে। নিমেষে সমস্ত কোলাহল, তাল-বেতাল দুর্বোধ্যপ্রায় বাক্যস্রোত স্তব্ধ হয়। সচকিত হয়ে যুবক শিক্ষক কান খাড়া করে।

"শুনেছেন?"

প্রশ্নকারের উচ্চকণ্ঠে গুরুত্বভাব। একটি শব্দের প্রশ্নই বিশেষ জরুরি ঘোষণার ভূমিকার মতো শোনায়।

"শুনেছেন?"

দ্বিতীয় বার কথাটি জিজ্ঞাসা করে প্রশ্নকার তৃপ্ত না হয়ে পারে না। তারই কণ্ঠ বিশৃঙ্খল কোলাহলের মধ্যে জয়লাভ করেছে। কারো মুখে টুঁ শব্দ নাই। সে মনস্থ করে, তার জয় সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করবে সে।

"বলতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে।"

আকস্মিক বিনয়ের সঙ্গে এমন অসম্ভব বিস্মৃতিশীলতার দোষ স্বীকার করে প্রশ্নকার সাড়ম্বরে নিশীথরাতে নদীপথ-স্টিমারের পটভূমিকায় তার বক্তব্য শুরু করে। অবনতমুখে যুবক শিক্ষক তার কথা শোনে। যা শোনে তার চেয়ে বেশি মনশ্চক্ষুতে দেখে, কারণ তার মনে হয় ঘটনাটি তার অজানা নয়। সে দেখে শীতকালের নিস্তেজ শান্ত নদী, তার বুকে স্টিমারের অত্যুজ্জ্বল সাদা সন্ধানী-আলো। জনমানবশূন্য নদীপাড়, গাছপালাঘেরা ঘুমন্ত গ্রাম। নদী কোথাও চওড়া, কোথাও সরু; কোথাও তার বুকে উলঙ্গ চর চাঁদের আলোয় ধবধব করে। কোথাও প্রাচীন দুর্গ-দেয়ালের মতো পাড় খাড়া, কোথাও স্থলের সঙ্গে প্রায় সমতল। বাঁক কোথাও ক্রমিক, কোথাও আকস্মিক। রাতের গভীর নীরবতায় জলযানের যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড উচ্চস্বরে আওয়াজ করে। ওপরে, লম্বা সাদা কোর্তার ওপর আলোয়ান জড়িয়ে সারেঙ্গ দূরগামী-চোখে, সন্ধানী-আলোর মতোই অহরহ এধার-ওধার তাকায়। মাথায় কিস্তি টুপি, মুখে ধার্মিক ব্যক্তির সৌম্যশুদ্ধভাব। সেখানে তাকে বড়ই একা এবং কিছুটা বেমানানও মনে হয়। যেন তারই পরিচালিত যান্ত্রিক জলযানের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নাই। তার দৃষ্টি যেন নদীতে নয়, দূরদিগন্তে, তারাতে বা ছায়াপথে নিবদ্ধ।

নদীপথ-স্টিমারের এ-নিরীহ বিবরণেই যুবক শিক্ষকের বুক কাঁপতে শুরু করে। সে বোঝে, বক্তা এখনো আসল কথা পাড়ে নাই। সে নদীরই মতো এঁকে-বেঁকে সর্পিল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে কেমন উদ্দেশ্যহীনভাবে, কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্তে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে। তার গন্তব্যস্থল যুবক শিক্ষক জানে। তবু তা শোনবার বাসনা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে সে শীঘ্র শ্রান্তিবোধ করতে শুরু করে।

নিঃসন্দেহে ভণিতায় বক্তা মাত্রাতিরিক্ত সময় নিচ্ছে। একজন শ্রোতা বলে ওঠে, "ঠিকই বলেছেন। সারেঙ্গ নয়, মোল্লা যেন। ভুল করে মসজিদের মিম্বর ছেড়ে জাহাজের পুলে দাঁড়িয়েছে।" হঠাৎ সে গলা উঁচু করে এধার-ওধার তাকায়। বলে, "ভালো কথা। এক-চোখ

BanglaBook.org

কানা মুয়াজ্জিন কী করেছে শুনেছেন?" তার বিবেচনায়, বক্তার সময় পেরিয়ে গেছে। আশান্বিতভাবে উৎসাহের জন্যে আবার এধার-ওধার তাকায় সে। উৎসাহ পেলে নিঃসন্দেহে কথার স্রোত অন্যপথে চালু করে দেবে। বলা বাহুল্য, দাঁড়ে থাকবে সে-ই। আলোচনার গতি-পরিবর্তনের ব্যাপারে সবারই মতো সে বিশারদ।

দুঃখের বিষয়, এ-সময়ে আরামদায়ক কুর্সিটির পাশে দু-একজন শিক্ষক হঠাৎ সজোরে নাকে শব্দ করে ওঠে, মুখে তাদের বিষম বিরক্তির ভাব। একটা বদগন্ধ উঠেছে। খোলাখুলিভাবে তারা আরবির মৌলবীর দিকে তাকায়। মৌলবীর চোখ নিমীলিত। মুখে আয়েশী ভাবের ওপর এবার একটা আধ্যাত্মিক ভাবের অস্পষ্ট আভাস যেন।

বক্তার বুঝতে দেরি হয় না, বিজয়ের উল্লাসে সে অসাবধান হয়ে পড়েছে, হাতের লাগাম ঢিলে করে দিয়েছে, প্রধান নদীপথ ছেড়ে খালে-বিলে কালক্ষেপ করেছে। শীঘ্র সে স্টিমারের সারেঙ্গের মতোই দক্ষতার সঙ্গে তার বক্তব্য সঠিকপথে চালিত করে।

হঠাৎ মোল্লাসদৃশ সারেঙ্গ দেখতে পায়, নদীতে কিছু একটা ভাসছে। যুবক শিক্ষকও দেখতে পায় এবং বিবরণ শোনবার আগেই ভাসমান বস্তুটিকে চিনতে পারে। নিশ্বাস বন্ধ করে তবু সে শোনে।

স্টিমার তখন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির মতো থরথর করে কেঁপে পূর্ণবেগে চলছে। সারেঙ্গের নির্দেশে এখানে-সেখানে নানারকম ঘণ্টা বাজে, স্টিমারের পার্শ্বদেশ থেকে প্রভূত বাষ্প নির্গত হয়, রাত্রির নীরবতার মধ্যে লস্করদের গলার আওয়াজ জেগে ওঠে। বিশাল তেলেপোকা যেন পথে-পড়ে-থাকা একটি বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র দ্রব্য পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে থামে।

নদীর বুকে ভেসে-যাওয়া বস্তুটি একটি নারীর মৃতদেহ। ফেঁপে-ফুলে কলাগাছ। দেহটি যে একটি যুবতী নারীর তা কেবল ডাক্তারই বলতে পারে। গলায় একটি রূপার হার আঁট হয়ে আছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ বিবস্ত্র।

"বিবস্ত্র?" একটি শিক্ষক সশঙ্ক নীতিবিদের কণ্ঠে উক্তি করে। কলাগাছের মতো ফাঁপা-ফোলা ভাসমান প্রাণহীন নারীদেহের পক্ষেও বিবস্ত্র হওয়া যেন দূষণীয়।

তখন যুবক শিক্ষকের হাতও কাঁপতে শুরু করেছে। সে-বিষয়ে সচেতন হয়ে মাসিক পত্রিকাটি আস্তে টেবিলের ওপর রেখে সে কম্পমান হাত লুকিয়ে ফেলে।

"একেবারে বিবস্ত্র। রূপার হারটা ছাড়া গায়ে কিছুই নাই।"

সে-বিষয়ে যুবক শিক্ষকও যেন চিন্তিত হয়। মনে-মনে বলে, পাছাপেড়ে সাদা শাড়িটার কী হল? পরক্ষণে সে স্বীকার করে, শাড়ির রঙ সে জানে না।

"বয়স বেশি না। বড়জোর, বিশ একুশ। ডাক্তার তাই বলে। ফেঁপে-ফুলে কলাগাছ হলেও ডাক্তাররা ঠিক ধরতে পারে।"

"পানির কলাগাছ না স্থলের কলাগাছ?" কেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটি শিক্ষক রসিকতা করার চেষ্টা করে। তার কাছে কলাগাছের সঠিক বিবরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

নীতিবিদের মুখ লাল হয়ে ওঠে। হয়তো তার কল্পনায় বাধা পড়েছে। সে হয়তো দেখছিল, একটি বিবস্ত্র সুন্দরী নারী কলাগাছের ভেলায় চড়ে নদীতে ভেসে যাচ্ছে, এমন সময় স্টিমারের অত্যুজ্জ্বল আলো তার ওপর পড়ে। হীরার ওপর যেন আলো পড়ে, কারণ সে-আলোতে তার রূপ বিচ্ছুরিত হয়। তার দেহ যদি কিছু স্ফীত হয়ে থাকে, তার কারণ দুর্দমনীয় যৌবনতার।

তারই কল্পনা-অগ্নিতে ইন্ধন যুগিয়ে বক্তা আবার বলে, "এমন অবস্থা, তবু বোঝা যায়, জীবিতকালে দেখতে-শুনতে মন্দ ছিল না।"

আরবির মৌলবী নিমীলিত চোখে এতক্ষণ নীরব হয়ে ছিল। এবার উচ্চস্বরে মন্তব্য করে, "তওবা তওবা! নীচজাতীয় মেয়েমানুষ হবে।"

BanglaBoi.org

এ-সব মন্তব্য যুবক শিক্ষকের কানে প্রবেশ করে না। সে অনুভব করে, একটি গভীর বিষাদে তার মন ভরে উঠেছে। দুঃখের সঙ্গে সে ভাবে,—যুবতী নারী অদৃশ্য হয়ে স্বপ্নাকাশের অম্লানকুসুমে পরিণত হতে পারল না। তবে কিছু বিস্ময়ের সঙ্গে এ-কথাও উপলব্ধি করে, তার দুঃখটা যুবতী নারীর জন্যে নয়, কাদেরের জন্যেই যেন। কাদেরের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হল না, তার সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হল। খবরটা জানতে পেলে হয়তো তার দুঃখের সীমা থাকবে না।

"আরো শুনুন।" বক্তা উচ্চ নাটকীয় স্বরে বলে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে তার দিকে তাকায়।

"মেয়েলোকটি আমাদেরই গ্রামের মানুষ।"

না, বিবস্ত্র হয়েও দেহ বিপুলাকার এবং মুখমণ্ডল কদাকার করেও যুবতী নারী তার পরিচয় ঢাকতে পারে নাই। শনাক্তকারের দৃষ্টির সামনে কোনো ছদ্মবেশই নিখুঁত নয়।

"মাঝির বউ!" গ্রাম থেকে নিরুদ্দিষ্ট যুবতী নারীর কথা স্মরণ করে একজন শিক্ষক আবিষ্কারকের উল্লাসে ঘোষণা করে।

গ্রামের করিম মাঝির বউ। স্বামীর নাম কী? নামটা ছমিরুদ্দীন, ছলিমউদ্দীন না করিমউদ্দীন, সে-বিষয়ে কিছু তর্ক হয়।

নাম যা-ই হোক, সে লম্বা পাড়িতে ঘরছাড়া। ঘরে বিধবা মা, চোখে কম দেখে, বাতের ব্যথায় সব সময়ে গোঙায়। তার অবিবাহিতা মেয়েও ঘরে। কানা, বিয়ে হবে না। বাড়ির পেছনে পুকুর, নদীটাও কাছে। দুটি গরু, একটি ছাগল, উঠানের কোণে মোরগ-মুরগির খাঁচা। মাঝি বড় গতর খেটে কাজ করে।

"নদীতে পড়ল কী করে?"

প্রশ্নটি সকলকে বুদ্ধির যুদ্ধে যোগদান দিতে আহ্বান করে। অবিলম্বে নানারকম মতামতে বিশ্রামঘরটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

নীতিবিদ অবশেষে নিশ্চিত কণ্ঠে রায় দেয়, "এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো কথা আছে। বলে দিলাম, মেয়েলোকটির ক্ষেতখামারে যাবার অভ্যাস ছিল।"

"নিশ্চয়ই কথা আছে। এমনি পানিতে ডুবে কেউ মরে না।"

"বললেন না বাজা মেয়েলোক? সে-ই হচ্ছে আসল কথা। বিয়ে-থার পর মেয়েমানুষের ছেলেপুলে না হলে পুরুষ-মরদের জন্যে মন খামখাম করে। জানা কথা।"

"না, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কথা আছে।"

যুবক শিক্ষক কোলাহলে সচেতন হয়ে বিহ্বলভাবে এধার-ওধার তাকায়। এত হট্টগোল কেন? তারপর সে লক্ষ করে, ভয়ানকভাবে তার হাত কাঁপছে। সভয়ে সে হাতদুটি টেবিলের তলে ঢাকে। তারপর কখন বিশ্রামঘরে একটি অস্বাভাবিক নিঃশব্দতা নাবে ক্রমশ তা গাঢ় হয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষকের শিরদাঁড়া টনটন করতে শুরু করে। এ-নিঃশব্দতা তার পছন্দ হয় না। ইচ্ছা করে চোখ তুলে তাকায় একবার কিন্তু সাহস হয় না।

অবশেষে দূর থেকে একটি গভীর কণ্ঠ ভেসে ওঠে।

"আরেফ মিঞা?"

এবার যুবক শিক্ষক চমকিত হয়ে চোখ তোলে কিন্তু কারো চেহারা স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। আবার কয়েক মুহূর্তব্যাপী অপ্রীতিকর নিঃশব্দতা।

'শরীর ভালো নয়?"

সাপের মতো ক্ষিপ্রভঙ্গিতে জিহ্বাগ্র দিয়ে সে ঠোঁট ভেজায়, কিন্তু শুষ্ক জিহ্বার তালু কাঠ-কাঠ মনে হয়। শরীরে অসীম দুর্বলতা। অসুস্থতারই লক্ষণ। অস্পষ্টকণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "শরীরটি ভালো বোধ হচ্ছে না।" তারপর পেটে হাত বুলিয়ে বলে, "হয়তো হজমটা ঠিক হয় নাই।"

তার একজন সহযোগী তাগ্‌ড়াকণ্ঠে হেসে ওঠে।

BanglaBook.org

"বড়বাড়ির উত্তম খাবার হজম হয় নাই? তাজ্জব কথা!" শিক্ষকদের মধ্যে যুবক শিক্ষকই বিনাখরচে বড়বাড়িতে থাকে-খায়দায় বলে তার প্রতি সকলের মনে একটু লুকানো ঈর্ষা। সুযোগ পেলেই সে-ঈর্ষা প্রকাশ পায়।

"ঠিক জানি না। জ্বরটর আসছে বোধহয়।"

অন্য এক সহযোগী চোখ টিপে বলে, "অবিবাহিত যুবক মানুষ। জ্বর-ব্যাধি ছাড়াও নানা রোগ ঘাড়ে চাপে।"

যুবক শিক্ষকের রক্তহীন মুখে এক ঝলক রক্ত দেখা দেয় তা লক্ষ্য করে উক্তিটি যথাস্থানে বিদ্ধ হয়েছে ভেবে সহযোগীটি ইঙ্গিতে অন্যান্য শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেদিকে।

রক্তঝলকের কারণ লজ্জা নয়, সহযোগীদের প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ। সে-ঘৃণা ক্রমশ এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে যে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। সে-পীড়াদায়ক ভাব থেকে রেহাই পাবার জন্যেই হয়তো সে বিপরীত চরিত্রের সন্ধান করে—এমন চরিত্র যার দয়ামায়া উদারতার শেষ নাই। বেশি সন্ধান করতে হয় না। তার মনশ্চক্ষুতে কাদের এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে-সঙ্গে সারা অন্তর অতি স্নিগ্ধ মধুর শীতল-হাওয়ায় জুড়িয়ে যায়, চারপাশে দেয়াল ধসে পড়ে বলে উন্মুক্ত দিগন্তের দিকে তাকাতে আর বাধা থাকে না। তার মনে হয়, উন্নতচরিত্র দয়াশীল স্নেহশীল কাদেরের তুলনায় তার সহযোগীরা সব অতি নীচমনা কলুষজর্জরিত মানুষ। এখন এই ভেবে তার পরম দুঃখ হয়, কাদের যাকে গভীর অপমান হতে বাঁচাতে চেয়েছিল, সে তাদেরই হাতে ধরা পড়েছে। এবার তারা তাকে নির্দয়ভাবে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

যুবক শিক্ষকের আর সন্দেহ থাকে না, কাদেরের অভিপ্রায় সে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সে-কথা তাদের মধ্যেই লুকানো থাকবে, কারণ অন্যেরা তার মর্ম বুঝবে না। তাদের দয়ামায়াশূন্য কুণ্ডলিত বিকৃত মনে যুবতী নারীর দেহটি নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টাই অতি বিচিত্র ঠেকবে। প্রতিশোধ নেবার শক্তি যার নাই, এমন দুর্বল অসহায় মানুষের মৃত্যুর মধ্যে যে-চরম অপমান সে-অপমানের তাৎপর্য কি তাদের কূপের মতো অন্ধকার বায়ুহীন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে? পরিত্যক্ত হতভাগিনী যুবতী নারীর প্রতি যে-গভীর স্নেহ-মমতা জেগেছিল কাদেরের মনে, তার মূল্য কি তারা বুঝবে? দীপ্ত উজ্জ্বল সূর্যের সঙ্কেত, কনকপ্রভা চন্দ্রালোকের আহ্বান, ঘূর্ণাবর্তের অস্থিরতার অর্থ তারা যেমন বুঝবে না, তেমনি এ-সব কথাও বুঝবে না। বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। কুণ্ডলীকৃত মনের পক্ষে সরল হওয়া বা দূরগামী হওয়া দুষ্কর।

যুবক শিক্ষকের মনে কাদেরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আরো গাঢ় হয়। একটু অবাক হয়ে সে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করে। সে যেন স্বচ্ছ, শঙ্কাভীতিশূন্যদৃষ্টিতে যুবতী নারীর দিকে তাকাতে পারছে। শুধু তাই নয়। যাকে সে জীবিতকালে কখনো দেখে নাই, মৃত্যুর পরও যার দিকে চোখ খুলে তাকাতে পারে নাই, তারই প্রতি কেমন একটু মমতাও বোধ করতে শুরু করেছে। অবশ্য সে বোঝে, কাদেরের মনের মমতার তুলনায় তা নগণ্য অংশ মাত্র। তবু তা দু-জনের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে যেন।

"যান, ছুটি নিয়ে নেন আজ। হেডমাস্টারকে বলুন গিয়ে।"

এ-উপদেশটা আসে আরবির মৌলবীর কাছ থেকে। যুবক শিক্ষক দেখে, উপদেশদাতা তারই দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যান্য শিক্ষকের দৃষ্টিও তার ওপর।

"পেটের ব্যথাটা একটু কমেছে যেন।" গলায় সুস্থতার আভাস জাগাবার চেষ্টা করে সে উত্তর দেয়।

সে-বিষয়ে তর্কের কোনো অবকাশ থাকে না। ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে ওঠে। টিফিনের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে।

BanglaBook.org

সাত

সে-রাতে পড়ানোর অধিবেশন শেষ হলে যুবক শিক্ষক কুদ্দুসকে বলে, "কাদের মিঞাকে ডেকে দেবে?"

তারপর বারান্দার কালো-সাদা বরফি-ছককাটা মার্বেলের মেঝের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চলভাবে দাঁড়ায়। সে বুঝতে পারে, ছেলেমেয়েরা কৌতূহলভরে তার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু তার শীর্ণমুখে কোনো ভাবান্তর ঘটে না। তার আচরণ-ব্যবহার আর তার ক্ষমতাধীন নয় যেন। কেবল কুদ্দুসের যেতে দেরি হচ্ছে দেখে তার চোখে অস্থিরতার ঈষৎ আভাস জাগে।

বারান্দা অবশেষে খালি হলে সে পূর্ববৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। দরজার ওপর দেয়ালঘড়িটা সশব্দে বাজে, ওপরতলা থেকে দাদাসাহেবের খড়মের আওয়াজ আসে। তারপর সে পদধ্বনিও থামে। প্রগাঢ় নীরবতায় তার বুকের স্পন্দন ঘড়ির আওয়াজের মতো জোরালো হয়ে ওঠে।

গতরাতেই সে বুঝতে পারে, দেখার চেষ্টা না করলে হয়তো কাদেরের সঙ্গে বহুদিন দেখা হবে না। এমনিতে দেখা হবার সুযোগ-সুবিধা কম। যুবক শিক্ষক নিজে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজে ব্যস্ত থাকে। দীর্ঘ দিনব্যাপী ইস্কুল আছে, দু-বেলা ছেলেমেয়েদের পড়াতেও হয়। অতএব সে স্ব-ইচ্ছায় দর্শন না দিলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা দৈবাৎ ঘটনার মতোই অনিশ্চিত। এ ক-দিন সে অপেক্ষায় থেকেছে, কিন্তু তার দেখা পায় নাই। স্পষ্ট বোঝা যায়, কাদেরের মনে তার সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছা নাই। থাকলে সে আসত। কাদেরের এ-নিস্পৃহতার কোনো অর্থ সে বোঝে না। তার রহস্যময় ব্যবহারের ফলে যুবক শিক্ষকের মনে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে যে-তীব্র ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সযত্নে সাজানো নানা প্রশ্ন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। প্রশ্নগুলি আর দরকারিও মনে হয় না। তার সঙ্গে একবার দেখা হলেই সে যেন তার উত্তর পাবে, মনেরও নিদারুণ বিহ্বলতা কাটবে।

আজ মগরেবের নামাজের সময় দাদাসাহেবের দিকে তাকিয়েই সাক্ষাতের আশায় বসে থাকার নিষ্ফলতা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে সে। বড়বাড়িতে কেবল দাদাসাহেবই কাদের সম্বন্ধে সচেতন। নামাজের আগে তাঁর ঈষৎ অনুসন্ধানী দৃষ্টি চোখে পড়লে যুবক শিক্ষক বোঝে, তিনি তারই সন্ধান করছেন। প্রায় দু-সপ্তাহ সে নামাজে যোগদান করে নাই। তার অনিশ্চিত মতিগতি তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন বটে তবু সে এলে তিনি খুশিই হন। আজ সে আসে নি দেখে তিনি ক্ষুণ্ন হন। সে-ক্ষুণ্নতা লক্ষ করে যুবক শিক্ষক তাঁর সঙ্গে একটা আন্তরিক যোগাযোগ বোধ করে। ফলে, মনে কেমন সবলতা আসে। সে-মুহূর্তেই সে স্থির করে, আজ রাতেই কাদেরকে ডেকে পাঠাবে। দাদাসাহেব নীরবে দিনের পর দিন তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু সে পারে না। আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষের পক্ষে কারো জন্যে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ভাঙন ধরেছে, কাদেরের সঙ্গে দেখা না হলে সে ভাঙন জোড়া লাগবে না। তারই নির্দেশে একটি অতিশয় অস্বাভাবিক কাজে সে তাকে সাহায্য করেছে, গভীর রাতে একটি নারীর মৃতদেহ বহন করেছে। বাক্স-পেটরা নয়, মেজ-কুর্সি নয় : মানুষের মৃতদেহ। তাকে কি কাদেরের কিছুই বলার নাই? সে হয়তো ব্যাপারটির অর্থ জানে, কিন্তু যুবক শিক্ষক জানে না। হয়তো তার পক্ষে সে-ব্যাপারে বিস্মৃত হয়ে আবার গতানুগতিক জীবনযাত্রায় নির্বিঘ্নে মনোনিবেশ করা সম্ভব, যুবক শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশেষে কুদ্দুসের চটির আওয়াজ কানে আসে। এবারও যুবক শিক্ষকের মুখে কোনো ভাবান্তর ঘটে না; কিন্তু উত্তরের তীব্র প্রত্যাশায় তার সমস্ত দেহ পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। তারপর সে-শক্ত আবরণের মধ্যে একটি দুর্বল হৃৎপিণ্ড থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। কুদ্দুস

BanglaBook.org

যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন সে তার দিকে তাকায় না। কেবল প্রশ্ন করে, "কী?"

"কিছু বললেন না।"

যুবক শিক্ষক উত্তরটির অর্থ যেন বোঝে না। ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে কুদ্দুসের দিকে তাকায়। সেখানে কোনো ব্যাখ্যা দেখতে না পেলে অকারণে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। বারান্দায় অখণ্ড নীরবতা।

"শুধু বললেন, কেন। বললাম, জানি না।" একটু ইতস্তত করে কুদ্দুস বলে। একটু থেমে সে আবার বলে, "যাই ?"

যুবক শিক্ষক কোনো উত্তর দেয় না। প্রশ্নটি হয়তো শোনে না। তারপর সে নিজেই বারান্দা অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যুবক শিক্ষকের মনে এ-বিশ্বাস জন্মায় যে, কিছু না বলার অর্থ সে আসবে না তা নয়। সাক্ষাতের জন্যে অনুরোধটি তার কানে পৌঁছেছে, এবার সময় করে সে আসবে। হয়তো একটু রাত হলে আসবে। লণ্ঠনের আলোটা কিছু কমিয়ে দরজাটি সামান্য খোলা রেখে চৌকির ওপর বসে যুবক শিক্ষক অপেক্ষা করতে শুরু করে। রাত তখন ইতিমধ্যে গভীর হয়ে উঠেছে।

মধ্যরাত গড়িয়ে গেলেও কাদেরের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেলে সে দরজা খুলে একবার বড়বাড়ির দিকে তাকায়। চাঁদ তখন উঠেছে, তবে আজ তার আলো নিস্তেজ। সে-আলোয় অন্ধকারাচ্ছন্ন বড়বাড়ি ফ্যাকাসে দেখায়। সেখানে কেউ জেগে নেই। কতক্ষণ সে বড়বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জানে না, অকস্মাৎ এক সময় সামনের দৃশ্য মুছে গিয়ে তার চোখের সামনে আগুনের নৃত্য শুরু হয়েছে। সে বুঝতে পারে, হঠাৎ একটি দুর্দান্ত ক্রোধ তাকে গ্রাস করেছে। যে-মানুষের প্রতি দু-বছরব্যাপী অস্পষ্ট কৌতূহল, অবিশ্রাম উদাসীনতার পর হঠাৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি, এমনকি কেমন একটা বন্ধুত্বের ভাব জেগেছে, সে-ই এ-ক্রোধের কারণ। কিছুক্ষণ পর দরজায় খিল দিয়ে সে বিছানায় ফিরে আসে। ক্রোধ তখনো পড়ে নাই। নিষ্ফল ক্রোধ সহজে মিটতে চায় না।

এক সময়ে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে। যখন আবার জেগে ওঠে, তখন সে কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাত্রির গভীরতায় কোনো আওয়াজ শুনতে পায় না। নীরবতা শূন্যতার মতো অন্তহীন মনে হয়। এ-নীরবতা কখনো যেন ভাঙে নাই, ভাঙবেও না। ক্রমশ একটি অবাস্তব ভাব এসে তার সময়-কালের চেতনাবোধ লুপ্ত করে দেয়। সে না ঘুমিয়ে অন্ধকারে চোখ খুলে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকে।

অবশেষে সে-চেতনাহীনতা থেকে ক্ষীণভাবে তার মনে একটি প্রশ্ন জাগে। সমস্ত ঘটনাটি কি একটি বিচিত্র দুঃস্বপ্ন? চমকিত হয়ে প্রশ্নটি সে ভেবে দেখে। যত ভাবে ততই তার সত্যাসত্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। তাই ঘটনাটি আগাগোড়া একটি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন। কাদেরকে ডেকে পাঠালে সে কুদ্দুসকে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন সে দেখা করতে চায়। তার প্রশ্নের অর্থ এবার সে বুঝতে পারে।

এ নোতুন জ্ঞান লাভে প্রথমে সে অস্থির হয়ে উঠে বসে। তার কি মস্তিষ্ক সুস্থ নয়? ঘরের কোণে সুরাহি থেকে পানি ঢেলে সে গলা সিক্ত করে, দু-চারবার পায়চারি করে, তারপর আবার চৌকিতে ফিরে এসে বসে। না, ঘটনাটি দুঃস্বপ্ন, দু-রাতব্যাপী দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন। সে-দুঃস্বপ্নের কথা সে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না। জানা সম্ভব নয়। সে জন্যেই কাদের জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন।

দুঃস্বপ্ন বাস্তবরূপ ধারণ করলেও তাতে কিছু অবাস্তবতা, কিছু যুক্তিহীনতার ছাপ না থেকে পারে না। ঘটনাটিতে এবার সে যে শুধু অবাস্তবতার সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পারে তা নয়, স্থানে স্থানে অযৌক্তিকতা তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, হত্যাকারীর আচরণ। হত্যাকারী বাঁশঝাড়ে বসে যুবক শিক্ষকের জন্যই অপেক্ষা

BanglaBoi.org

করে। সে যখন জানতে পারে, বাঁশঝাড়ের বাইরে সে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সে যুবতী নারীর জীবনাবসান করে। তারপর সে চাঁদের আলোয় হাওয়ার মতো মিলিয়ে যায়। বাইরে কে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে? বড়বাড়ির আত্মভোলা দরবেশ ধরনের মানুষ, কাদের। সে-ও তারই জন্যে অপেক্ষা করে যেন। স্বপ্নে ছাড়া এমন ঘটনা কি সম্ভব? স্বপ্নে কাদেরের আবির্তাবের কারণও সে বুঝতে পারে! কাদের নাকি দরবেশ। বিস্ময় কী, সে-ই সে-স্বপ্নের একটি বিশিষ্ট চরিত্র হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে?

"সবটাই দুঃস্বপ্ন। অত্যাশ্চর্য দুঃস্বপ্ন।" যুবক শিক্ষক আপন মনে ঘোষণা করে। স্বপ্নে যে সে প্রায় সারারাত ছুটোছুটি করেছে পাগলের মতো, সে কথা স্মরণ হলে তার একটু হাসিও পায়। না, সে নয়, যুক্তি-বিচার-বুদ্ধি থেকে স্বপ্নই পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

"আষাঢ়ের গল্পের মতো স্বপ্ন।" এবার সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে। তারপর সে কৌতুকভরে স্বপ্নটির বিশ্লেষণকার্য নিয়ে অগ্রসর হয়।

দুঃস্বপ্নের সেখানেই কি শেষ! আষাঢ়ে গল্পের শেষ নাই : যার যুক্তি নাই, তার সমাপ্তিও নাই।

বড়বাড়ির কাদের যে নিষ্কর্মা হলেও কারো সাতে-পাঁচে নাই, দরবেশ না হোক তব আপন খেয়ালেই থাকে—সে-ই পরদিন রাতে তার ঘরে এসে হাজির হয়। সামাজিকতা বা প্রতিবেশীর সঙ্গে একটু গল্পগুজবের তাগিদে নয়, একটি ব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে বলে। নিষ্কর্মা হলেও যে-মানুষ সম্ভ্রান্ত বংশজাত এবং ভদ্রলোক, সে বলে, দয়া করে চলুন, বাঁশঝাড়ের মৃতদেহটি নদীতে ফেলে দিয়ে আসি। দু-বছরে তার সঙ্গে কখনো আলাপ-সালাপ হয় নাই, প্রস্তাবটাও অতি বিস্ময়কর, তবু বড়বাড়ির মানুষ তারই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছে, কী করে না করে? দ্বিরুক্তি না করে গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে সে কাদেরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য কার্যান্তে কাদের চন্দ্রালোকের মধ্যে মিলিয়ে যায়। স্বপ্নটি হয়তো তাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা সমীচীন মনে করে না। ধরে রাখলে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, সে ভয় আছে।

"অদ্ভুত স্বপ্ন।" যুবক শিক্ষকের বিস্ময় কাটে না।

সেখানেই স্বপ্নের জের শেষ হয় না। স্বপ্নের ফেনিয়ে গল্প-বলার আত্যন্তিক নেশা কাটে না। যুবক শিক্ষকের মতো উর্বরমস্তিষ্ক কল্পনাপ্রবণ খদ্দের পেয়ে সহজে কি তাকে হাতছাড়া করে?

নদীতে দেহটি নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সাহায্য-সহায়তার আদর্শ উদাহরণের পর দিন-দুপুরে ইস্কুল পর্যন্ত ছুটে যেতে স্বপ্নটি দ্বিধা করে না। যখন তার সহযোগীর টিফিনের সময় গল্পগুজব করে, তখন বিশ্রাম ঘরের এক কোণে বসে নিদ্রাভিভূত হয়ে সে স্বপ্নে দেখে নদীপথ, স্টিমারের সন্ধানী-আলো, পুলের ওপর দাঁড়িয়ে সারেঙ্গ মোল্লার মতো সারেঙ্গ, এক সহযোগী যার দীর্ঘ বিবরণ দেয়। কিন্তু স্বপ্নের পক্ষে পথভ্রষ্ট হওয়া অতি স্বাভাবিক। একটু ঘুরে-ফিরে আসল কথায় ফিরে আসে নদীবক্ষে যুবতী নারীর দেহটির আবিষ্কার।

একটি কথা ভেবে যুবক শিক্ষক কিছু তাবিত হয়। তার মনে পড়ে, স্বপ্নের শেষভাগে সহযোগীদের প্রতি সে নিদারুণ ঘৃণা বোধ করেছিল। সে জানত না, তার মনের অন্তরালে মানুষের প্রতি এমন ঘৃণা লুক্কায়িত। এ-গোপন ঘৃণার পরিচয় পেয়ে সে ক্ষণকালের জন্যে শঙ্কাই বোধ করে। এ-ঘৃণার উৎপত্তি কোথায় ?

প্রশ্নটির উত্তর না পেলে সে স্বপ্ন-বিশ্লেষণকার্যে প্রত্যাবর্তন করে। যুবক শিক্ষক স্বীকার করে, এখানে-সেখানে অযৌক্তিকতা থাকলেও ঘটনার অনুক্রম-বিন্যাসের ব্যাপারে এবং বিষয়বস্তুর কাঠামোতে আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্নটির মধ্যে কোনো দোষঘাট নজরে পড়ে না। সে জন্যে তার কালোস্রোতে সে ভেসে যেতে পেরেছে, তাকে বাস্তব ঘটনা বলে গ্রহণ করতে তার দ্বিধা হয় নাই। না, সে-সব অযৌক্তিকতা স্বপ্নটির প্রধান দুর্বলতা নয়; তার প্রধান দুর্বলতা

BanglaBook.org

অন্যত্র। সে-দুর্বলতাটি এখন সে বুঝতে পারে বলেই স্বপ্নটির অসত্যতা তার চোখে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

স্বপ্নটির সে-চরম দুর্বলতা তার আসল উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত। একটি অপঘাত মৃত্যুর কথা বলে দর্শকের মনের ভীতি-আঘাত জাগানোই তার আসল উদ্দেশ্য নয়, কারণ অপরিচিতা একটি নারীর এমন দুর্ভাগ্যের কথায় মনে যতই ভীতি-আঘাতের সঞ্চার হোক না কেন, তা তেমন গভীর বা স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। অপঘাত-মৃত্যুটি উদাহরণ মাত্র, একটি সাংঘাতিক উপসংহারে পৌঁছাবার উপাদান। উপসংহারটি হল, মানুষের জীবনের প্রতি মানুষের নির্দয় নিষ্ঠুর উদাসীনতা। সেটাই স্বপ্নের মর্মকথা। স্বপ্নটির আসল উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ যুবক শিক্ষকের বিপর্যস্ত মন। যুবতী নারীর মৃত্যুর সঙ্গে যে-নৃশংসতা জড়িত সে-নৃশংসতা নয়, মনুষ্যত্বহীন ভয়াবহ সে-মর্মকথাই তাকে এমন গভীরভাবে বিচলিত করেছে।

যুবক শিক্ষক এখন বুঝতে পারে, সে-মর্মকথাই স্বপ্নটির প্রধান দোষ, প্রধান দুর্বলতা। নানাবিধ গাল্পিক কারুকার্যের মধ্যে কৌশলে লুকানো যে-অসত্যের ওপর স্বপ্নটি স্থাপিত, সেদিকে একবার দৃষ্টি পড়লে স্বপ্নটি স্বপ্নেরই মতো ধূলিসাৎ হয়, যে-বৃক্ষটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সত্যরূপ ধারণ করেছিল, মূল নেই বলে সে-বৃক্ষটি নিমেষেই ধরাশায়ী হয়। বাস্তব জীবনে মানুষ মানুষের প্রতি এমন নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন নয়।

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে না কী করে স্বপ্নটি তাকে এমনভাবে সম্মোহিত করতে পেরেছিল যে সে প্রশ্ন না করে তার হাতে বন্দি হয়ে থেকেছে, দিনের আলোতেও তার হাত কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে নাই। এর অর্থ কি এই যে, তার মন অতিশয় দুর্বল? অথবা, মনের অদৃশ্য কোনো অংশে অতি গোপনে সে কি নিজেই এমন অদ্ভুত বিশ্বাস পোষণ করে? তীব্র ঘৃণার পরিচয় পেয়ে সে সামান্য শঙ্কিত হয়েছিল : এবার তার শঙ্কার অবধি থাকে না।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন অবশেষে দূর হয়েছে এ-জ্ঞানে তার মনে যে-গভীর স্বস্তির ভাব দেখা দেয়, তাতে সব শঙ্কা ভেসে যায়। একটি কুৎসিত সর্বধ্বংসী জন্তুর শ্বাসরোধ-করা-আলিঙ্গন থেকে অবশেষে সে মুক্তিলাভ করেছে। সে আর কিছু ভাবতে চায় না। সব উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ কেটেছে বলে সারা দেহমন কেমন অপরিসীম ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়, তবু সে-ক্লান্তি অতি মধুর, অতি সুখদায়ক মনে হয়। না, সে আর কিছুই ভাবতে চায় না। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে সে অনুভব করে, একটি আরামদায়ক ক্লান্তি স্রোতের মতো বইছে এবং তাতে তার চিন্তাশক্তি তলিয়ে যাচ্ছে। কেবল তাতে বাষ্পের মতো হাল্কা উষ্ণ একটি কৃতজ্ঞতার ভাব ভেসে থাকে। সে-কৃতজ্ঞতা এই জন্যে যে, মানুষের ভাগ্য খামখেয়ালি এবং নির্মম হলেও মানুষ মায়ামমতাশূন্য নয়, অতি নিস্পৃহের নিকটও অন্যের জীবন মূল্যহীন নয়।

যুবক শিক্ষকের শীর্ণ-শুষ্ক দেহের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আবার মোহময় জীবিতাশা প্রবাহিত হয়। অন্ধকার ঘরে বাঁশের দেয়ালের ছিদ্রে-ছিদ্রে বাইরের চন্দ্রালোক চিকন কারুকার্য বিস্তার করেছে। সে-দিকে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তার মনে প্রার্থনার মতো ভাব আসে, সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ একটু সজল হয়ে ওঠে। মনে-মনে ভাবে, স্নিগ্ধ-সুন্দর চাঁদের পৃষ্ঠদেশ মানুষ দেখতে পায় না। তার অন্ধকার অংশে যদি কদর্যতা-নিষ্ঠুরতা থাকে, তা যেন কেউ কখনো না দেখতে পায়।

তার মাথার তলে তুলায়-ঠাসা ছোট বালিশের এক কোণে রঙিন রঙের সুতায় তৈরি একটি গোলাপ ফুল। তারই পাশে এবার দু-এক ফোঁটা চোখের পানি নিঃশব্দে ঝরে পড়ে। মনে-মনে সে আবার বলে, কোনো দুঃস্বপ্নও যেন কখনো সত্য না হয়।

অবশেষে শ্রান্ত যুবক শিক্ষক ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘরের কোণে দড়িতে একটি লুঙ্গি ঝোলে। তার কোণটা একটু ছেঁড়া। গতকাল লুঙ্গিটি সে ধুয়েছে কিন্তু ছেঁড়া অংশটি সেলাই করবার সময় পায় নাই।

দ্বিতীয় রাতে বাঁশঝাড়ে অপেক্ষাকৃত নূতন লুঙ্গিটির সে-দশা ঘটে।

আট

এক সময়ে দরজায় করাঘাত শুরু হয়। প্রথমে আস্তে, সন্তর্পণে; তারপর হঠাৎ সে-করাঘাত কেমন দ্রুত এবং জোরালো হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে বাইরে-দাঁড়ানো মানুষটি ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে।

যুবক শিক্ষকের ঘুমটা আলগোছে ভাঙে বলে তার মনে হয় সে জেগেই ছিল। করাঘাতে সে বিচলিত হয় না : সে-করাঘাত বিরক্তিকর কিন্তু তার দরজায় নয় যেন। অন্ধকারের মধ্যে চোখ খুলে পাশের দেয়ালের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। সেখানে সূক্ষ্ম কারুকার্যের নক্‌শা কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর কাদেরের কণ্ঠস্বর এবং করাঘাত যুগপৎ শোনা যায়। এবার যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, কোনটা সত্য কোনটা অসত্য, কোনটা বাস্তব কোনটা অবাস্তব সে-বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগেই তার দেহ একটি গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, মনে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার উপস্থিতি সম্বন্ধেও সে সচেতন হয়।

দরজা খুললে বাইরে কাদেরের ছোটখাটো কিন্তু প্রশস্ত দেহটির ছায়া জেগে ওঠে। তাকে উপেক্ষা করেই যেন যুবক শিক্ষক একবার আকাশের দিকে তাকায়। রঙটা ঠিক ধরতে পারে না। না কালো না ধূসর; না আলো না অন্ধকার। সময় নির্ধারণ করা যেন সম্ভব নয়। তারপর শীতটা লাগে বলে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কাদের অনুচ্চ কিন্তু কেমন হুকুমের কণ্ঠে বলে ওঠে, "বাতি জ্বালান।"

যুবক শিক্ষক নীরবে বাতি জ্বালানোর কাজে মনোনিবেশ করে। প্রথমে দেশলাই খুঁজে পায় না; এখানে-সেখানে হাতড়ায়। অবশেষে দেশলাইটি যখন খুঁজে পায় তখন সে বুঝতে পারে, তার হাত একটু কাঁপতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন? সে নিজেই বিস্মিত হয়। এতক্ষণে তার মনে আর কোনো সন্দেহ নাই যে, সে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে বলেই কাদের এসেছে। সময়টা হয়তো একটু বেখাপ্পা, কিন্তু তার এ-আবির্ভাবের আর কোনো কারণ নাই।

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঘরের অন্ধকারটা অবশেষে কাটে। মশারি সরিয়ে কাদের বিছানার কোণে বসে। একবার তাদের চোখাচোখি হয়। তারপর কাদের কতক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থেকে অকস্মাৎ আঙ্গুল মট্‌কাতে শুরু করে। দশ আঙ্গুল থেকে দশাধিক আওয়াজ বের করে সে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটি সিগারেট ধরায়। মুহূর্তের মধ্যে তার গন্ধে ছোট ঘরটি ভরে ওঠে।

যুবক শিক্ষকের মুখে এখনো কথা সরে না। একবার সে ভাবে কাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, কত রাত হয়েছে, কিন্তু কথাটি জানা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়। তবু তার কেমন সন্দেহ হয়, কাদের অন্য কোনো সময়ে এলেই ভালো ছিল। তাকে ডেকে পাঠাবার কারণটি সে যেন নিজেই এখন বুঝতে পারে না। তাই হয়তো মনে কেমন ভয়। তার হাত দুটিতে ঈষৎ কম্পন এখনো থামে নাই।

অসংযত মনকে সংযত করবার চেষ্টা করে সে ভাবে, ভয়ের কিছু নাই। কাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছিল, সে এসেছে। সেটাই বড় কথা। যার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এ-ক'দিন সে এমন ব্যাকুল হয়ে ছিল, সে এখন দু-হাত দূরে বসে। ভয়ের কারণ কী?

যে-বিশ্বাসটি নিয়ে সে শুয়ে পড়েছিল, তার কথা একবারও মনে হয় না। সেটি যেন

সব–ভুলানো রূপকথা, যার মধ্যে তার বিহ্বল মন একটু শান্তির জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন যে–কঠিন সত্যের সামনে সে দাঁড়িয়ে, সেখানে তার স্থান নাই।

তবু সত্য কী? যাকে সে ডেকে পাঠিয়েছে সে তাকে ডেকে পাঠানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে কী উত্তর দেবে? ক–দিনব্যাপী মনের গভীর বিপর্যস্ততা সত্যে পরিণত করা কি সম্ভব?

কাদের কোনো কথা না বললে যুবক শিক্ষক অবশেষে স্বস্তিই বোধ করে। আড়চোখে তার দিকে একবার তাকায়। অভ্যাসমতো লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চল হয়ে বসে, ভুবনভুবর্লোকে তার যেন কিছুই বলবার নাই। হয়তো কিছুক্ষণ এমনি বসে থেকে এক সময়ে হঠাৎ উঠে চলে যাবে। যুবক শিক্ষক ভাবে, সেটাই ভালো হবে। ব্যাখ্যা–কৈফিয়তের, প্রশ্ন–উত্তরের প্রয়োজন উঠবে না। না, সে কিছুই জানতে চায় না। যে–অন্ধকারাচ্ছন্ন গোলকধাঁধায় সে প্রবেশ করেছে, সে–গোলকধাঁধা হতে সে বের হতে চায় না। অন্ধকারই শ্রেয়, কারণ অন্ততপক্ষে অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পায় না।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা আওয়াজ হয়। চমকিত হয়ে যুবক শিক্ষক কাদেরের দিকে তাকায়। সে তারই দিকে তাকিয়ে। হাতে খোলা সিগারেটের বাক্স।

"সিগারেট খাবেন?"

যুবক শিক্ষকের সিগারেটের অভ্যাস নাই। একটু পরে ক্ষুদ্রকণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "না।"

কাদের আরেকটি সিগারেট ধরায়। হয়তো কল্পনা, কিন্তু যুবক শিক্ষকের মনে হয়, কাদের কেমন অস্থির–অস্থির বোধ করে। কিন্তু তার অর্ধনিমীলিত চোখের দিকে তাকিয়ে অস্থিরতার কোনো আভাস দেখতে পায় না। বরঞ্চ সেখানে যেন গভীর বিষাদের ছায়া। তারপর যুবক শিক্ষক অকস্মাৎ স্বচ্ছন্দ–বোধ করতে শুরু করে। না, ভয়ের কোনোই কারণ নাই। বাস্তবজগতে যদি ভীতির কারণ থাকে তা এখন অতি দূরে, দিগন্তরালে কোথাও হবে। তবু দূরগত সে–ভীতি যদি তার মনে বন্ধুত্ব–সান্ত্বনার জন্যে ক্ষুধা সৃষ্টি করে থাকে, তবে কাদেরই তা মেটাতে পারে। হয়তো কাদেরের মনেও বন্ধুত্ব–সান্ত্বনার জন্যে তেমনি ক্ষুধা। সেও কি এ–ক'দিন মানসিক কষ্ট–যন্ত্রণা ভোগ করে নাই? দু–জনেরই বন্ধুত্বের বিশেষ প্রয়োজন। তারা একটি গুপ্তকথার মালিক। সে–গুপ্তকথা একাকী বহন করা যদি কষ্টসাধ্য হয়, তবে বন্ধুত্বের সাহায্যেই তারা তা অনায়াসে বহন করবে, মনের বিহ্বলতাও জয় করতে পারবে।

লণ্ঠনের পল্‌তেটা বাঁকা বলে কাচের একপাশ ক্রমশ কালো হয়ে ওঠে, শীঘ্র তার অনুজ্জ্বল আলো আরো অনুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারা কি অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছে?

না, সত্যিই সে কিছুই জানতে চায় না। কাদেরের উপস্থিতিতেই সে সন্তুষ্ট। মনে যদি কোনো ইচ্ছা বোধ করে সে–ইচ্ছা কাদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে, তাকে তার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত করবার জন্যে। জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস মানুষের সহানুভূতি, সহৃদয়তা, স্নেহমমতা। সে–বিষয়ে নিশ্চিত হলেই মানুষ বিভীষিকা–নিষ্ঠুরতার দিকে নির্ভয়ে তাকাতে পারে।

একটু হেসে দুঃসাহসীর কণ্ঠে যুবক শিক্ষক সজোরে বলে, "দিন্ একটা সিগারেট।"

সিগারেট হাতে নিয়ে কৌতুকভরে কিছুক্ষণ সেটি নেড়ে–চেড়ে দেখে, মুখে হাসি–মাখা দুষ্টু ছেলের কৃত্রিম ভাব।

"একবার বিড়িতে দু–একটা টান দিয়েছিলাম।"

ধূমপানের ব্যাপারে সে যে একেবারে অজ্ঞমূর্খ মানুষ নয়, সে–কথা প্রকাশ করে সে আনাড়ির মতো সিগারেটটি জ্বালায়। প্রথম টানেই তার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়, তবু সে পিছ্‌পা হয় না। মনে হয়, অন্তরটা যেন আরো স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। তাছাড়া এ–কথাও সে অনুভব করে যে, দুজনের মধ্যে যেন বন্ধুত্বের পুল পড়ছে।

"মাথা ঘুরছে।" সে–টি যে অতিশয় আনন্দেরই বিষয় তা কণ্ঠভঙ্গিতে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়ে এবং তাতে বিন্দুমাত্র না দমে, সে ঘন–ঘন ফুঁকতে থাকে : দৃষ্টি সিগারেটের

জ্বলন্ত অংশ থেকে নড়ে না। কাদের নীরব হয়েই থাকে। সে-নীরবতা সম্বন্ধে সে সচেতন না হয়ে পারে না।

"ইস, সত্যিই চরকির মতো মাথাটা ঘুরছে।" আবার মহা-উল্লাসে তার মস্তিষ্কের অবস্থার কথা ঘোষণা করে সে এবার একগাল ধোঁয়া ছাড়ে। মনে-মনে ভাবে, কী করে কাদেরকে এ-কথা বলে যে সত্যিই সে কিছু জানতে চায় না? সত্য হলেও সব স্বপ্ন বলে মেনে নিতে সে রাজি। যা ঘটেছে তা ঘটেছে—তা বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে গেলে ক্ষতি কী ? অন্ততপক্ষে আজ কোনো কথাই সে তুলতে চায় না।

"কী করে রোজ এত সিগারেট খান?" কৃত্রিম শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে যুবক শিক্ষক মন্তব্য করে। কাদের জবাব দেয় না।

হঠাৎ যুবক শিক্ষক বোঝে, এ-ভাঁড়ামিপনা অর্থহীন, তাতে কাদের বিন্দুমাত্র আমোদ বোধ করছে না। আড়চোখে সে আবার তাকায় তার দিকে। তার চোখ প্রায় নিমীলিত। তবে তার কারণ যে নিদ্রা নয়, তা বুঝতে তার দেরি হয় না। কাদেরের মুখে একটি অস্বাভাবিক কাঠিন্য।

কাদের কি তার উৎফুল্লতা এবং ভাঁড়ামিতে বিরক্ত হয়েছে? নিঃসন্দেহে সে একটু ভাঁড়ামি করেছে বটে কিন্তু সে ভাঁড়ামির কারণ আকস্মিক সুখবোধ। তার উৎফুল্লতায় কিছুটা কৃত্রিমতা যদি দেখা দিয়ে থাকে তার কারণ উৎফুল্লতা তার চরিত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ নয় : সে জানে না তা কী করে প্রকাশ করতে হয়। অবশ্য সে কাদেরের বিরক্তির কারণ বোঝে। তার বিষাদাচ্ছন্ন মনে এ-মাত্রাহীন ভাঁড়ামি ও উৎফুল্লতা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকেছে। উৎফুল্ল হবার কোনোই কারণ নাই। নদীর বুকে যুবতী নারীর দেহটি আবিষ্কার করে তারা কি তার সব পরিকল্পনা পণ্ড করে নাই?

সিগারেটের কথা ভুলে গিয়ে যুবক শিক্ষক কতক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। ঘরে প্রগাঢ় নীরবতা। সে-নীরবতার মধ্যে এবার যুবক শিক্ষকের মনে হয়, বিভীষিকাময় যে-অবাস্তব জগৎ থেকে সে মুক্তি পেয়েছে বলে কল্পনা করেছিল, সে-অবাস্তব জগৎই তার চারধারে পূর্বের মতোই তাকে ঘিরে আছে। গভীর হতাশার সঙ্গে সে ভাবে, সত্যিই সে কিছুই জানতে চায় নাই। এখনো সে জানতে চায় না। কাদের যদি তাকে তার বন্ধুত্বের সামান্য প্রমাণ দিত তবে ভাঁড়ামির কোনো প্রয়োজন বোধ সে করত না। কাদের কি বুঝতে পারে না বন্ধুত্বের জন্যে তার মনের এ তীব্র আকাঙ্ক্ষা? পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে কাদেরেরই, তবু তার সংসাধনকার্যে পরম-বিশ্বাসীর মতো দ্বিরুক্তি না করে তাকে কি সে সাহায্য করে নাই? কিন্তু শুধু বিশ্বাসেই দিন কাটানো যায় না। কিছু পরিষ্কারভাবে না জেনে একাকী সে-ভার কী করে সে বহন করে? সে-ভার ক্রমশ আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

কেমন কঠিন গলায় কাদের হঠাৎ ডাকে, "মাস্টার!"

এ-নামে সে যুবক শিক্ষককে কখনো ডাকে নাই। বস্তুত আজ পর্যন্ত কোনো নামেই সে তাকে সম্বোধন করে নাই। চমকিত হয়ে সে কাদেরের দিকে তাকায়। তবে সেখানে বন্ধুত্বের ক্ষীণতম আভাস সে দেখতে পায় না।

তারপর এক মুহূর্তের জন্যে কাদেরের চোখ যেন ঝলকে ওঠে। পূর্ববৎকণ্ঠে সে আবার বলে, "আপনার মতলব কী?"

প্রশ্নটি যেন আকাশ থেকে পড়ে, বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। তার মতলব? বিস্ময়ের ধমকটা কাটলে সে অনুচ্চস্বরে বলে, "আমার মতলব?"

কাদের তার প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করে না বলে নীরব হয়ে থাকে। কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয়, সে যুবক শিক্ষকের কাছে এটি অর্থপূর্ণ উত্তর আশা করে।

যুবক শিক্ষক কোনো উত্তরই খুঁজে পায় না। কাদেরের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটি তাকে যে-ব্যথা দিয়েছে, কেবল সে-ব্যথাই সে অনুভব করে। অনেক ভেবেও প্রশ্নটির যথার্থ কোনো কারণ

BanglaBook.org

দেখতে পায় না।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে কাদের একবার এক পলকের জন্যে চোখ খুলে যুবক শিক্ষকের দিকে তাকায়। তারপর আবার প্রশ্ন করে, "ডাকাডাকি করতে শুরু করছেন কেন?"

নুতন প্রশ্নটিও যুবক শিক্ষক নীরবে শোনে। অতি সহজবোধ্য প্রশ্ন, তবু তারও অর্থ সে বুঝতে পারে না। তবে পূর্বের প্রশ্নের মতো এ-প্রশ্নটিও তাকে আঘাত দেয়। না, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের পুল তো পড়েই নাই, বরঞ্চ তারা প্রশস্ত নদীর দু-পাড়ে দাঁড়িয়ে। পাশে বসে থাকা কাদেরের চেহারাটা হঠাৎ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। না, এ-লোকটিকে সে চেনে না।

একটু পরে দুর্বলকণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "ডেকেছি এ কারণে যে আমি কিছুই বুঝতে পারি না।"

একটু ভেবে কাদের প্রশ্ন করে, "কী বুঝতে পারেন না?"

যুবক শিক্ষকের দুর্বলকণ্ঠের ওপর দিয়ে হঠাৎ দমকা হাওয়া বয়ে যায়। সজোরে মাথা নেড়ে সে উচ্চস্বরে বলে, "কিছুই বুঝতে পারি না।"

এই কথার পুনরাবৃত্তিতে কাদের সন্তুষ্ট হয় না। তার মুখে বিরক্তির ভাব দেখা দেয়। কণ্ঠেও সে বিরক্তি প্রকাশ পায়।

"কী বুঝতে পারেন না?"

যুবক শিক্ষক এবার বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে যেন শক্ত ফাঁদে পড়েছে, যে-ফাঁদ থেকে সে অক্ষতদেহে বের হতে পারবে না। কিছুক্ষণ আগে যার সঙ্গে সে একটা বন্ধুত্বের সম্ভাবনা কল্পনা করে কেবল তার উপস্থিতিতেই সুখবোধ অনুভব করতে শুরু করেছিল, সে-ই তাকে এ-ফাঁদে ফেলেছে। সে বন্ধু না হোক, শত্রু হবে কেন? না, তাকে কিছুই বলা যায় না। যা সে বুঝতে পারে না তা যেন অতি মূল্যবান। তা ব্যক্ত করা যায় না। একটু হাওয়া লাগলেই তা ভেঙে যাবে।

"কথা বলছেন না কেন?"

আবার কাদেরের কঠিন গলা তার কর্ণগোচর হয়। এবার তার গলায় সে বিচলিত হয় না। কাদেরের প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনোই প্রয়োজন সে বোধ করে না। কাদের তার সঙ্গে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার অন্তরটা অভিমান-ক্রোধে জমে যায়।

নাকে বিরক্তি-ক্রোধের আওয়াজ করে কাদের এবার চুপ হয়ে যায়। তাকে ডেকে পাঠিয়ে যুবক শিক্ষকের এ অদ্ভুত ব্যবহার তার কাছে অর্থহীন মনে হয়।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর কাদেরের মনোভাবে হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়। যুবক শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে সে আস্তে বলে, "শোনেন।"

যুবক শিক্ষক যে শোনবার জন্যে তৈরি তার কোনো প্রমাণ না পেলেও একটু থেমে আবার বলে, "মানুষের জীবনটা অতি ভঙ্গুর। একটুতেও মট্‌কে যায়।"

এ-গভীর দার্শনিকোচিত উক্তিটি যুবক শিক্ষকের কানে গেল কি গেল না, তা বোঝা যায় না। সে তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। একটু থেমে কাদের আবার বলে, "একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, কী আর করা যায়? ডাকাডাকি করে আর লাভ কী?"

এবারও যুবক শিক্ষক নির্বাক হয়ে বসে থাকে। কিন্তু ক্রমশ তার বসে থাকার ভঙ্গিতে পূর্বের অভিমান-ক্রোধের কঠিনতা যেন মিলিয়ে যায়। মনে হয়, সে যেন গভীরভাবে ভাবছে। এমন একটা নিগূঢ় কথা যার রহস্য ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তারই রহস্য ভেদ করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। না, ঠিক তা নয়। একটি কথা তার মাথায় ঢোকবার চেষ্টা করছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু সে-কথাটি তার চেয়েও বেশি শক্তিবান। তাকে ঠেকাবার চেষ্টায় সে কেবল গলদঘর্ম হয়ে ওঠে।

সে-কথাকে ঠেকানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে-টুকু শক্তি ছিল সে-শক্তিও নির্বিবাদে অন্তর্ধান করেছে। কী দিয়ে সে তার সঙ্গে লড়াই করবে? লড়াইর ছলনা পরিত্যাগ করতেই

BanglaBook.org

গভীর অবসাদে তার দেহমন ভরে ওঠে।

বাইরে উঠানে মৃদু আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সেদিকে একবার অকারণে তাকিয়ে কাদের কেমন হৃদ্যতার সঙ্গে বলে, "বুঝলেন?"

যুবক শিক্ষক সবই বোঝে। প্রথম থেকেই সে সব কথা বুঝেছিল, কিন্তু মন স্বীকার করতে চায় নাই। ঘটনার নৈকট্যে তা না বুঝে উপায় ছিল না, কিন্তু কিছু সময় পেরিয়ে গেলে কথাটা মন আর মানতে চায় নাই। তারপর থেকে সে সত্যকে এড়াবার জন্যে বাঁদরের মতো কল্পনার গাছের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় ঝুলে-ঝুলে বেড়াচ্ছে। সত্যটি গ্রহণ করা কি এত সহজ? একবার গ্রহণ করলে চিরকালের জন্যে জীবনে একটা ফাটল ধরবে না? তারপর কি পৃথিবী সে-ই পৃথিবী থাকবে?

"বুঝেছি।" অকস্মাৎ ঘন-ঘন মাথা নেড়ে যুবক শিক্ষক বলে।

বোঝা কি অতই শক্ত ব্যাপার? বোঝা-না-বোঝার মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। চুলের মতো সরু সীমারেখার ওপারেই সত্য। এধারে আশা-ভরসা, ওধারে হতাশা-নিরাশা। পা বাড়ালেই ওধারে চলে যাওয়া যায়, তবু সে-সীমারেখা সে অতিক্রম করতে চায় নাই। সীমারেখাটি যাতে অতিক্রম করতে না হয় তার জন্যে সে কাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে, তাকে অশেষ গুণাগুণেও আবৃত করেছে যাতে সে-প্রয়াসে সে সফল হয়।

আবার ঘন-ঘন মাথা নেড়ে যুবক শিক্ষক আপন মনে বলে, "কেন বুঝব না? আপনি আমার আত্মীয়-কুটুম্ব বা দোস্ত মানুষও নন, বুঝতে বাধা কী?" শুধু তা-ই নয়, তার সঙ্গে যুবক শিক্ষকের পরিচয়ও ছিল না। মুখ দেখাদেখি হয়েছে বটে, কিন্তু কখনো কথার আদান-প্রদান হয় নাই। তবু কথাটা সে বিশ্বাস করতে চায় নাই। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু মানুষ না হোক, পরিচয়ও না থাক, একটি মানুষের সম্বন্ধে এমন কথা বিশ্বাস করা কি সোজা?

যুবক শিক্ষকের আচরণে কাদেরের স্থৈর্য একটু টলে ওঠে যেন। ইতস্তত করে সে বলে, "কী বুঝেছেন!"

"বুঝেছি, বুঝেছি।" আবার যুবক শিক্ষক দ্রুতভাবে মাথা নেড়ে বলে, কণ্ঠে এবার কোনো দুর্বলতার চিহ্ন নাই। সে এ-কথা বুঝে তৃপ্তি পায় যে, বঞ্চনার আঘাতের ফলে মনে যে একটি অসহনীয় তিক্ততার ভাব এসেছিল, সে-ভাব এখন ক্রোধে চাপা পড়েছে। এখন ক্রোধ দাউ-দাউ করে জ্বলছে, এবং সে-ক্রোধে সে গভীর তৃপ্তিই পায়। বারবার একটি কথা মনে পড়ে, বারবার সে-ক্রোধ ফুঁসে ওঠে। কী দুঃসাহস! যাকে কাদের হত্যা করেছে, তার দেহ নদীতে ফেলবার জন্যে তারই সাহায্য নিতে তার একটু দ্বিধা হয় নাই? বুকে কত সাহস! শীর্ণদেহ যুবক শিক্ষক আগুনের লেলিহান শিখায় যেন দীর্ঘকায় হয়ে ওঠে, তার রক্তহীন শুষ্ক মুখ যেন অত্যুজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। না, শুধু দুঃসাহস নয়, অন্য মানুষের প্রতি কী অবজ্ঞা! যুবক শিক্ষক যেন তুচ্ছ কীটপতঙ্গ। এত ক্রোধ সত্ত্বেও যুবক শিক্ষক নিষ্কম্পকণ্ঠে বলে, "আপনার সাহসের সীমা নাই।"

কাদের কথাটি বুঝবার চেষ্টা করে। তারপর কী বুঝে উত্তর দেয়, "ভয় পেলে মানুষ কী না করে? মানুষের গলার আওয়াজ পেলে জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। বললাম না দুর্ঘটনা? দুর্বল সুতায় জীবন বাঁধা। জীবন কী?"

যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না। মনে হয় কাদেরের কোনো কথা তার শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করতে রাজি নয়। তার কথার কি আর কোনো মূল্য আছে?

তার মানসিক অবস্থা দেখে কাদেরের মনে এবার হয়তো কিছু ভয়ের সঞ্চার হয়। তার এ বিচিত্র আচরণের কোনো অর্থই খুঁজে পায় না। কিন্তু যুবক শিক্ষককে আর কী বলবে? সে নীরব হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

ক্রোধ অবশেষে উপশমিত হলে যুবক শিক্ষক কতক্ষণ নিঃস্ব বোধ করে। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বলে, "যান, বাড়ি যান।" কাদেরের উপস্থিতিতে সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে।

কাদের যাবার কোনো লক্ষণ দেখায় না। তাকে একটু অন্যমনস্ক মনে হয়। তারপর হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে কথা বলতে শুরু করে। অনেকটা আপন মনেই। তাছাড়া, কেমন ইশারা-ইঙ্গিতেই বলে যেন। মনের কথা খুলে বলার তীব্র ইচ্ছা বোধ করলেও সব খুলে বলতে যেন বাধে। হয়তো যা বলে তার অর্থ সে নিজেই বোঝে না। প্রথমে সে আশ্বিন মাসের কথা বলে। কেন সে মাসের কথা বলে তা প্রথমে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু একটু নীরব থেকে কথাটি বোধগম্য করে। আশ্বিন মাসেই যুবতী নারীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

যুবক শিক্ষক তার কথা শুনেও শোনে না। শুনে লাভ কী? যে-কথাটি সে জানতে পেরেছে তারপর আর কোনো কথা জানার প্রয়োজন সে বোধ করে না। যে-কলুষতা সে সমগ অন্তরে সমগ্র দেহে বোধ করে সে-কলুষতা কোনো কথায় কি কাটবে? তাছাড়া, কাদেরের কণ্ঠস্বর তাকে পীড়া দেয়।

আশ্বিন মাসের কথাটার উল্লেখ করেই চার মাস ডিঙিয়ে কাদের সেদিনের বাঁশঝাড়ের ঘটনায় এসে পৌঁছায়। হয়তো সে চার মাসে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই, ঘটলেও তার আর কোনো মূল্য নাই। বাঁশঝাড়ের কথা বলতে-বলতে তার বলার ভঙ্গিটা কিছু সাবলীল হয়ে ওঠে।

শীঘ্র তাকে বাধা দিয়ে যুবক শিক্ষক আবার বলে, "যান, বাড়ি যান।"

এবার নীরব হয়ে কাদের কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর কালো মুখে কিন্তু সহিষ্ণুকণ্ঠে বলে, "ঘটনাটা বুঝিয়ে বলছি।"

এ-উক্তিটা যুবক শিক্ষকের অসহ্য মনে হয়। কী তাকে সে বোঝাবার চেষ্টা করছে? যে-কথাটি জানতে চায় নাই বা বিশ্বাস করতে চায় নাই, সে কথা সে-জানতে পেরেছে। তারপর বাকি সব কি অর্থহীন নয়? কাদের যে-কথা এখনো পরিষ্কারভাবে বোঝে নাই, সে-কথাই সে এবার তাকে বলে।

মুহূর্তের মধ্যে কাদেরের মুখে গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে সে কতক্ষণ যুবক শিক্ষকের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সে প্রশ্ন করে, "আপনি জানতেন না?"

যুবক শিক্ষক উত্তর না দিলেও শীঘ্র কাদেরের মুখ ক্রোধে বিকৃত হয়ে ওঠে, তার স্বাভাবিক গভীর স্থৈর্য ভীষণভাবে টলে ওঠে। সে যে হত্যাকারী সে-কথা যুবক শিক্ষক জানত না? এবং সে-কথা সে নিজেই তাকে বলেছে?

যুবক শিক্ষক এবার চিৎকার করে ওঠে, "যান যান।" তার মনে হয়, কাদেরের দেহ থেকে কলুষতা সমাপ্তিহীন ধারায় তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, আর তার উপস্থিতি সহ্য করা অসম্ভব।

কাদের আপন ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে। এক সময়ে আর দ্বিরুক্তি না করে সে উঠে চলে যায়। সে কোনোদিকে তাকায় না।

বাইরে উঠানে তখন সূর্যের প্রথম সোনালি রশ্মি পড়েছে, দূরে মাঠে কুয়াশাও জমতে শুরু করেছে। যুবক শিক্ষক বোধ করে তার গলা-মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। অত্যধিক তৃষ্ণায় তার ভেতরটা যেন জ্যৈষ্ঠের রোদপোড়া মাঠের মতো চড়চড় করে।

ঘরের কোণে সুরাহিতে শীতল পানি। কিন্তু সে নড়ে না।

আপন মনে সে প্রশ্ন করে, অবশেষে সে কি অবাস্তব জগৎ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে?

বাস্তব জগতে সে যদি প্রত্যাবর্তন করে থাকে, তবে সেখানেও অতৃপ্তির জ্বালার শেষ নাই যেন।

BanglaBook.org

নয়

রবিবার সকাল। বেলা ন'টার দিকে যুবক শিক্ষককে আসতে বলে দাদাসাহেব নিচের তলার বারান্দায় খোলা জানালার পাশে রোদে পিঠ দিয়ে বসেন। হাতে তসবি, মুখভাব গম্ভীর। একটু পরে পায়ের মৃদু শব্দ শুনতে পেলে সেদিকে না তাকিয়ে বলেন, "বসেন।"

অদূরে হাতল-ছাড়া কাঠের চেয়ারে সঙ্কুচিত হয়ে যুবক শিক্ষক বসে, মনে অস্বচ্ছন্দতা। কেন তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন? গত ক'দিনে শিক্ষকতার ব্যাপারে তার কোনো গাফিলতি হয়েছে কি? বা তার বিসদৃশ আচরণ-ব্যবহারের খবর তাঁর কাছে পৌঁছেছে কি? এসব ব্যাপারে তিনি যদি প্রশ্ন করেন তবে সে কী বলবে? সকালবেলা কাদেরের মুখে সত্য কথাটি জানবার পর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তার দেরি হয় নাই। কিন্তু পরে আরেকটি কথা সে বুঝতে পারে। সে-কথাটি ভেবে দেখা দরকার। না, গত ক'দিনের কথা দাদাসাহেবকে বলবার জন্যে এখনো সে তৈরি নয়।

অবশেষে দাদাসাহেব গলা সাফ করেন। তারপর অস্পষ্টকণ্ঠে যুবক শিক্ষককে তার বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধাভরে সেও একটি উপযুক্ত উত্তর দেয়।

সামান্য নীরবতার পর দাদাসাহেব পুনর্বার গলা সাফ করেন। তারপর তসবিতে তাঁর আঙ্গুল সঞ্চালন থেমে যায়।

"আমার ছোটভাই কাদের মিঞার সঙ্গে আপনার নাকি দেখাসাক্ষাৎ হয়। শুনে বড়ই খুশি হলাম।"

তিনি বলেন না যে আজ সকালে ওপরের জানালা দিয়ে কাদেরকে যুবক শিক্ষকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে স্বচক্ষে দেখেছেন। কাদেরকে কেমন রাগান্বিত মনে হয়েছিল। দু-জনের মধ্যে অকস্মাৎ এই মেলামেশার কারণ কী, যুবক শিক্ষকের ঘর থেকে এমন রাগান্বিতভাবে সে বেরিয়ে আসবেই-বা কেন? ক'দিন আগে কাদেরের বিচিত্র দৃষ্টির কথা এখনো তিনি ভোলেন নাই।

গভীর বিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে—যে কণ্ঠ সম্পূর্ণ খাঁটি মনে হয় না, তিনি আবার বলেন, "তার ভাবসাব সাধারণ মানুষের মতো নয়।" সামান্য ইতস্তত করে কথাটা বলেই ফেলেন। "একটু দরবেশী ভাব আছে তার মধ্যে।"

যুবক শিক্ষক নত মাথায় তাঁর কথা শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। কাদেরের বিষয়েই তিনি যে তাকে ডেকে পাঠাবেন, সে-কথা সে ভাবে নাই। হয়তো এখন সে তার সম্বন্ধে কিছু বলতে প্রস্তুত নয় বলেই সে-কথাটি ভাবতে পারে নাই। না, এই মুহূর্তে কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাঁশঝাড়ের সত্যটি সে জানতে পেরেছে বটে কিন্তু সে-সত্যটি যেন অতিশয় নগ্ন। বস্তুত, তা এত নগ্ন যে তাতে না আছে সম্পূর্ণ সত্য, না আছে তার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর। সব কথা জানার আগে তার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

দাদাসাহেবকে একটু অপ্রস্তুত মনে হয়। তাঁর পক্ষেও কাদেরের কথা তোলা সহজ হয় নাই। তিনি বড়বাড়ির মুরুব্বি। বয়স বা আত্মীয়তার বন্ধন যাই হোক, সে-বাড়ির প্রত্যেক বাসিন্দার প্রতি তিনি যে শুধু একটি গভীর দায়িত্ব বোধ করেন তা নয়, তাদের সঙ্গে একটা আন্তরিক যোগাযোগও বোধ করেন। কোথায় কার দোষত্রুটি, কোথায় কার গুণ বা গুণের সম্ভাবনা, সে-সব তাঁর অজ্ঞাত নয়। এমনকি প্রত্যেকের হৃদয়ের কথাও তিনি জানেন বলে তাঁর বিশ্বাস। এ-বিষয়ে কেবল কাদেরের ক্ষেত্রেই একটা ব্যতিক্রম বোধ করেন। সে-জন্যে এবং তার সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার শেষ নাই বলে অনাত্মীয়ের সামনে তার কথা তোলা তাঁর পক্ষে সহজ নয়।

যুবক শিক্ষক নীরব হয়ে থাকলে তিনি এবার অনিশ্চিতকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "আপনাদের মধ্যে কী আলাপ হয়?"

BanglaBook.org

যুবক শিক্ষক ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে একবার তাকায়। বর্তমান মানসিক অবস্থার জন্যে প্রশ্নটি সরলভাবে গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কাদের যে দরবেশ সে-বিশ্বাসটি তাঁর মনে কি এতই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে তিনি তার প্রমাণের জন্যে এমন উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন, না তার সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে?

কারণ যা-ই হোক, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার পক্ষে এখন সত্যিই সম্ভব নয়। তার মনে সন্দেহ নাই, শীঘ্র তাঁকে বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি বলতে হবে, কিন্তু যে-নগ্ন সত্যটি আজ সকালে সে জানতে পেরেছে, তাতে সে তৃপ্ত নয়। যে-ঘটনাটি তার মনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, নিঃসন্দেহে সে-ঘটনাটির রহস্য ঘুচেছে : নানাপ্রকার কল্পনা-অনুমানের জটিল জাল থেকে মুক্তি পেয়ে তা একটি স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে। তবু কাদেরের মুখে যা জানতে পেরেছে, তা একটু ভেবে দেখতেই তার মনে এ-ধারণা জন্মে যে, এখনো সব কথা জানা হয় নাই। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে জানার পূর্বে দাদাসাহেবকে এমন একটি নিদারুণ কথা কী করে বলে?

আজ সকালে কাদের স্বীকার করেছে, সে-ই যুবতী নারীর হত্যাকারী। তবে সেটি ঠিক হত্যা নয়, একটি দুর্ঘটনা। বাঁশঝাড়ের বাইরে যুবক শিক্ষকের পদধ্বনি এবং পরে তার গলার শব্দ শুনতে পেলে হঠাৎ ভয়ে দিশেহারা হয়ে সে যুবতী নারীর গলা টিপে ধরেছিল। হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, তার মুখের আওয়াজ বন্ধ করার জন্যে। মুখ না ঢেকে গলা টিপে ধরেছিল কেন সে তা বলতে পারে না : তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না। আসল অপরাধী সে-সংজ্ঞাবুদ্ধিগ্রাসী মারাত্মক ভয়। সে-নিদারুণ ভয়ের কারণ কী? তার পরিবারের সুনাম। এককালে যে-পরিবারের এত নামডাক ছিল, সে-পরিবারের আজ আগের মতো ধন-দৌলত না থাকলেও ধার্মিকতা দান-দয়া-নিষ্ঠার জন্যে এখনো অনেক সুনাম। কাদের সে পরিবারেরই মানুষ। যে-পরিবার নিষ্কলঙ্কভাবে দীর্ঘদিন সুনামের সৌরভ ছড়িয়েছে, তার সে-সুনামে কলঙ্কের ছাপ বসাতে কার বুকে সাহস হয়? কথাটা অবিশ্বাস্য ঠেকে না।

কাদের যখন বুঝতে পারে একটি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তখন সে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু অল্পদূর যাবার পর তার মনে একটা সন্দেহ জাগে : সত্যই কি কোনো মানুষের শব্দ সে শুনেছিল? শীতের এমন গভীর রাতে কে আসবে বাঁশঝাড়ে? যুবতী নারীর স্বামীর কথাই কেবল তার মনে আসে কিন্তু সে যে গ্রামে নাই সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত। সে কি ভুলবশত এমন মর্মান্তিক কাণ্ড করে বসেছে?

কথাটা পরখ করে দেখবার জন্যে নির্বোধের মতো সে বাঁশঝাড়ের সামনে এবার ফিরে আসে। পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে এধার-ওধার চেয়ে দেখে, কেউ কোথাও নাই। এমন সময় সে যুবক শিক্ষককে বাঁশঝাড় থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসতে দেখে। সে যেন তারই দিকে তাকিয়ে। শুধু তাই নয়। সে তারই দিকে আসছে। পালাবার কোনো সময় নাই, মুক্তস্থানে গা-ঢাকা দেবারও কোনো উপায় নাই। কাঠের পুতুলের মতো হতভম্ব হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে তার উপস্থিতির একটা কৈফিয়ৎ বের করার চেষ্টাও করে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনো কৈফিয়ৎ খুঁজে পায় না। তারপর যুবক শিক্ষক তার সামনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু সে কোনো প্রশ্নই করে না। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে পালিয়ে যায়। সে যেন ভূত দেখেছে।

এবার কাদের দুটি কথা বুঝতে পারে। প্রথমত, যুবতী নারী যে এখনো বেঁচে থাকতে পারে সে-কথা আশা করা বৃথা। দ্বিতীয়ত, সে-ই যে হত্যাকারী সে কথা যুবক শিক্ষক জানে। বস্তুত, তাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাঠে-ঘাটে ছুটাছুটি করতে দেখলে সে-বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তবু কথাটা সামনাসামনি একবার যাচাই করে দেখবার জন্যে পরে সে তারই ঘরে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে সে একটি অতি ভীত-বিহ্বল, বাকশূন্য মানুষ দেখতে পায়। সন্দেহের কোনোই অবকাশ থাকে না।

এ-বিবৃতিতে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই : নিঃসন্দেহে তার প্রতিটি শব্দ সত্য। প্রথম রাতের

BanglaBook.org

বিবরণটি এতই নিখুঁত যে তাতে কোনো ছিদ্র নাই, প্রশ্ন-জেরার স্থান নাই। অস্পষ্টতা দেখা দেয় দ্বিতীয় রাতের বিবরণে।

যুবতী নারীর দেহটি নদীতে ফেলার ব্যাপারে কাদের যুবক শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল কেন? কথাটির কোনো ব্যাখ্যা কাদের দেয় নাই। তখন প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নাই বলে যুবক শিক্ষকও তাকে সে-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন বিষয়টির ব্যাখ্যা শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়। চারটি সম্ভাব্য উত্তর তার দৃষ্টিগোচর হয়। এক—বাঁশঝাড়ের ঘটনার পর কাদেরের মনে নিশ্চয়ই গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হয়তো একটি ঘোরতর পাপ-বোধে সে জর্জরিত হয়ে পড়ে। তখন একটি বিচিত্র যুক্তির সাহায্যে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যুবক শিক্ষক মৃতদেহটির বহনকার্যে অংশগ্রহণ করলে সে-পাপের খানিকটা তার মধ্যে স্থানান্তরিত হবে। দুই—তার এই বিশ্বাস হয় যে, যুবতী নারীর মৃত্যুর সঙ্গে যুবক শিক্ষক জড়িত, কারণ বাঁশঝাড়ে সে উপস্থিত না হলে দুর্ঘটনাটি ঘটত না। অতএব দেহ-বহনকার্যে সাহায্য করা তার কর্তব্য। তিন— যুবতী নারীর মৃত্যুর কথা যুবক শিক্ষক ছাড়া অন্য কেউ জানে না। পরদিন সে কথাটা প্রকাশ করে নাই সত্য কিন্তু ভবিষ্যতে করবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। দেহটির বহনকার্যে তার কাছ থেকে একবার সাহায্য আদায় করতে পারলে তার মুখ বন্ধ করা সহজ হবে। দুর্বলচিত্ত লোকটি সাহায্য করতে রাজি না হতে পারে, সে-সম্ভাবনা নিশ্চয়ই কাদেরের মনে জেগেছে। হয়তো সে-ব্যাপারে তাকে বাধ্য করার ফিকির-ফন্দিও সে ভেবে নিয়েছিল। হয়তো তাকে ভয় দেখাত বা কোনো প্রকারে তার হৃদয় গলাবার ব্যবস্থা করত। কিন্তু কাদেরকে কিছুই করতে হয় নাই। দু-একবার ডাকতেই সে বিনাবাক্যে তার অনুসরণ করে। চার—ভয়াবহ কাজটি একা করতে সাহস পায় নাই। কাজটি একাকী সম্পন্ন করার লাভ নিশ্চয়ই তার চোখে পড়েছে। যুবক শিক্ষকের অগোচরে দেহটি একবার অদৃশ্য হয়ে গেলে সে কোনো অভিযোগ আনলেও সাক্ষীর অভাবে তা প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু নির্জন রাতে বাঁশঝাড়ে একটি যুবতী নারীর সঙ্গে মিলিত হওয়া এক কথা, গভীর রাতে তার মৃতদেহটি বহন করা অন্য কথা। সে স্বভাবজাত খুনী-ডাকাত নয়।

ভীতি, স্বার্থপরতা, দুরভিসন্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত এর কোন্‌টি সত্য?

আরেকটি কথাও কুজ্‌ঝটিকাবৃত মনে হয়। কী কারণে কাদের দেহটি নদীতে ফেলবে ঠিক করে? আজ সকালে সে-বিষয়টি সে স্পর্শই করে নাই।

হত্যাকাণ্ডের জের টানা বিপজ্জনক। দেহটি নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজনটা কি তার কাছে এতই জরুরি মনে হয়েছে যে সে দ্বিতীয় রাতে বিপজ্জনক কাজটি করতে দ্বিধা করে নাই? হয়তো পাপের ফল সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য না-হয়ে-যাওয়া পর্যন্ত পাপী মনে শান্তি পায় না। এ-কথা যদি সত্যি হয় তবে কাদেরের চোখে যে-ব্যাপার একটি দুর্ঘটনা হিসেবে শুরু হয়েছিল, সেটি আর দুর্ঘটনা থাকে নাই, শীঘ্রই তা পাপে পরিণত হয়।

আজ সকালে ঘটনাটির নির্মম সত্য জানার পর যুবক শিক্ষকের মনে হয়েছিল : আর কোনো কথা জানার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দেখতে-না-দেখতে নূতন অনেক প্রশ্ন তার মনে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাদেরের গুরুতর অপরাধের কথা প্রকাশ করা তার কর্তব্য। কিন্তু কর্তব্যটির সঙ্গে একটি গভীর দায়িত্ব জড়িত মনে হয়। অপরাধটি প্রকাশ করা অতি সহজ কিন্তু সব কথা না জেনে কী করে সে তা প্রকাশ করে? তার মনে হয়, অপরাধের গুরুত্ব অপরাধের ফলের উপরই নির্ভর করে না। একটি যুবতী নারীর খুন অতি গুরুতর ব্যাপার। তারই ওজনে অপরাধ মেপে দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু দুটির ওজন সমান না-ও হতে পারে। সব কিছু না বুঝে কথাটা প্রকাশ করলে কর্তব্যপালন হবে কিন্তু তাতে দায়িত্বহীনতাও প্রকাশ পেতে পারে।

তাছাড়া, সর্বপ্রথম তাকে ঘটনাটি পুরাপুরিভাবে বুঝতে হবে। সামাজিক কর্তব্যপালনের চেয়ে সেটাই তার কাছে বড় মনে হয়। অপরাধী কে সে কথা সে জানতে পেরেছে,

কিন্তু অপরাধের অর্থ এখনো সে বোঝে নাই।

যুবক শিক্ষককে চুপ করে থাকতে দেখে দাদাসাহেব কিছু বিস্মিত হন। তাঁর মনে হয়, দরবেশীর কথাটা তুলে তিনি ভুল করছেন। যুবক শিক্ষক হয়তো সে-কথা বিশ্বাস করে না বলে কী উত্তর দেবে তা ভেবে উঠতে পারছে না। সে-বিষয়ে তাকে নিশ্চিত করার জন্যে এবার তিনি বলেন, "কাদের একা একা থাকে। আপনার সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করেছে দেখে মনটা খুশি হয়েছে।" তাদের মধ্যে কী আলাপ-আলোচনা হয় সে-বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্যের কথা তিনি এবার উল্লেখ করেন না। একবার বলেছেন, দু-বার বলতে পারেন না। তারপর তাঁর মুখে একটি কৌতূহলশূন্যতার ভাব জাগে। সেটা কৃত্রিম মনে হয়।

হঠাৎ যুবক শিক্ষক মাথা তুলে বেদনার্ত দৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে তাকায়। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলে সে ইতস্তত করে দৃষ্টি নাবিয়ে অস্ফুট গলায় বলে, "বেআদবি মাফ করবেন কিন্তু আজ কিছু বলতে পারব না।"

দাদাসাহেব এবার তাঁর বিস্ময় ঢাকবার চেষ্টা করেন না। তার উক্তিটা বুঝবার চেষ্টা করে গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "কী কথা বলতে পারেন না?"

যুবক শিক্ষক চোখ না তুলে কয়েকবার কেবল ঘন-ঘনভাবে মাথা নাড়ে। দাদাসাহেবের দিকে তাকাতে বা তাঁকে আর কিছু বলতে তার সাহস হয় না। নিজের দৃষ্টিতে এবং কণ্ঠে সে-বিশ্বাস যেন হারিয়েছে। তার মনে হয়, আজ কিছু বলতে পারবে না এ-কথা বলেই সে ইতিমধ্যে অনেক কথা বলে ফেলেছে।

দাদাসাহেব আর কিছু বলেন না। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বারান্দা অতিক্রম করতে শুরু করেন। তাঁর খড়মের আওয়াজ আজ কেমন বেসুরো মনে হয়।

শঙ্কিত হয়ে যুবক শিক্ষক বোঝে, তার হাতে সময় আর বেশি নাই।

দশ

অপরাহ্ণে সামনের উঠানে ছেলেমেয়েরা শোরগোল করে খেলা করে। দাদাসাহেব বাড়িতে নেই। সম্ভবত তাঁর পীরের সঙ্গে দেখা করতে শহরে গেছেন।

চৌকিতে লম্বা হয়ে শুয়ে থেকে যুবক শিক্ষক এক সময়ে হঠাৎ উঠে বসে। শোরগোলটা যেন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠেছে। পাম্প-সু পায়ে দিয়ে সবুজ আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সে দ্রুতপদে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করে। মেঘহীন আকাশে নিরুত্তপ্ত সূর্যের মধুবর্ষী সোনালি আলো। হাওয়া নেই বলে নিশ্চলতা, তবু চতুর্দিকে আলো আর রঙের নিঃশব্দ ঘূর্ণিঝড়। সেদিকে যুবক শিক্ষকের দৃষ্টি নাই। তারপর নদীর তীরে পৌঁছে সে অনিশ্চিতভাবে থামে। নদীর নিস্তেজ মসৃণ ধারায় এবং ওপারে কাশবনের শুভ্র বিন্যাসেও সোনালি আভা। এ-সবও সে দেখে না। তার নিদ্রা-তৃষ্ণার্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একটি তীব্র আশায় জ্বলজ্বল করে। কোথায় সে যেন আলো দেখতে পায় : তার প্রশ্নের একটি উত্তর যেন আলিঝালি চোখে পড়ে। তার সম্পূর্ণ রূপ দেখবার জন্যে সে অধীর হয়ে ওঠে। অনিশ্চিতভাবে থেমে পড়ে সে দাঁড়িয়েই থাকে।

সারা দুপুর একটি কথাই তার মনে বারেবারে ঘোরে : কী কারণে কাদের দেহটি নদীতে ফেলবে ঠিক করে? সে এ-কথার কোনো সন্তোষজনক উত্তর এখনো পায় নাই। আসল সত্য জেনেও যা সে জানতে পারে নাই, তা সে-উত্তরের মধ্যেই পাবে তাতে তার সন্দেহ নাই। সে-উত্তরটা হাতের নাগালে এসেছে। কেন কাদের বিপজ্জনক কাজটি করতে তৈরি হয়? হাতুড়ি দিয়ে প্রশ্নটিকে সে যেন বার বার পেটায়। তাতে যে স্ফুলিঙ্গ জাগে, সে-স্ফুলিঙ্গ তার চোখেও প্রতিফলিত হয়।

যুবক শিক্ষক অনেক কথাই নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। অকস্মাৎ অন্ধ ভয় হলে বুদ্ধি-

BanglaBook.org

বিবেচনাশক্তি হারিয়ে একটি মানুষ অন্য একটি মানুষের জীবন নিতে পারে। যত বীভৎস হোক, তবু সেটা দুর্ঘটনা বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। সে-কথা যুবক শিক্ষক সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছে। এ-কথাও সে স্বীকার করে, জীবন অতি ভঙ্গুর! জীবন দুর্বল সুতায় বাঁধা। সামান্য অসাবধানতায় জীবনাবসান হতে পারে। কিন্তু কাদের কী কারণে দ্বিতীয় রাতে বাঁশঝাড়ে আবার ফিরে গিয়েছিল?

যুক্তিতে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা সে দেখতে পায়। জীবন ভঙ্গুর সে-কথা সে মানে, কিন্তু জীবনের মূল্য নাই সে-কথা সে মানে না। অন্ততপক্ষে যারা জীবনের মূল্য বোঝে, তারা যখন সে-কথা বলে তখন সে মানতে রাজি নয়। তার মনে হয়, সে-কথা মানলে জীবনের ভিত্তিই ধূলিসাৎ হবে, বেঁচে থাকার পশ্চাতে কোনো যুক্তিসঙ্গত অর্থ থাকবে না। না, জীবন মূল্যহীন নয়। অতএব কাদেরের উক্তিটি সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়; তার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপটি ধোঁকা মাত্র।

ভয়জাত আকস্মিক দুর্বলতার কথাও গ্রহণযোগ্য। নিদারুণ ভয়ে কাদের একটি জঘন্য কাজ করেছে। কিন্তু সে-দুর্বলতা সাময়িক মানসিক অবস্থা মাত্র : বিশেষ একটি মুহূর্তে মনের একটি বিশেষ অবস্থা। কিন্তু সে সাময়িক মানসিক অবস্থা সময়-কালনিরপেক্ষ চরম সত্য বলে মেনে নিলে একটি অতীব শোচনীয় সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে হয় : মানুষ পশুর চেয়েও অধম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সে-নিদারুণ অন্ধভীতির মুহূর্তটিই একমাত্র সত্য এবং তার পশ্চাতে বা সম্মুখে কিছু নাই, সে-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পূর্বের উক্তির মতো এ-উক্তিটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। অতএব, জীবনের ভঙ্গুরতা এবং সাময়িক মানসিক দুর্বলতা—যার অকস্মাৎ গোলযোগের ফলে একটি যুবতী নারীর জীবনাবসান ঘটে—সে-দুটির একটিও নিরালম্ব সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

যুবক শিক্ষকের চোখ ছুরির মতো ধারালো হয়ে ওঠে। তার শীর্ণ মুখেও প্রত্যাশার তীক্ষ্ণতা।

সে দৃঢ়ভাবে আপন মনে বলে, একটি মুহূর্তের কথা বলে কাদের তার চোখে ধুলা দিয়েছে। তাই সে-মুহূর্তের পেছনে সে তাকাতে পারে নাই; সে-নিদারুণ মুহূর্তে চোখ এমন ঝলসে যায় যে আর কিছু দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পেছনে সে তাকাতে পারে নাই বলেই কাদেরের দ্বিতীয় রাতের ব্যবহারের কারণও সে বুঝতে পারে নাই।

তারপর এক সময়ে যুবক শিক্ষকের শিরা-শিরায় আঁট হয়ে থাকা মুখে হয়তো বহুদিন পরে একটা ক্ষীণ হাসির আভাস দেখা দেয়। সে বুঝতে পারে, তার সন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, সে তার উত্তর পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কাদেরের যে-চেহারা আজ প্রত্যুষে ঘৃণ্য মানুষের চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছিল, সে-চেহারাটি একটি নূতন রূপে তার মনশ্চক্ষুতে উদয় হয়। চেহারাটি একটি স্বল্পভাষী, গোপন স্বভাবের প্রেমিক মানুষের। সে-জন্যেই যুবক শিক্ষকের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস দেখা দেয়।

কাদের তার দুষ্কীর্তির চিহ্ন ধ্বংস করবার জন্যে যুবতী নারীর দেহটি নদীতে ফেলে নাই। একটি কারণেই মানুষ মানুষের অন্তিম ব্যবস্থা না করে পারে না। সে কারণ, প্রেম-ভালবাসা। যুবতী নারীর দেহটি পরিত্যক্ত জঞ্জালের মতো বাঁশঝাড়ে পড়ে থাকবে সে-কথা তার অসহ্য বোধ হয়েছে। না, প্রথম রাতের সে-নিদারুণ মুহূর্তের পেছনের ইতিহাস না জানলে দ্বিতীয় রাতের ঘটনা বোঝার উপায় নাই। যে-ব্যাপারটি দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, সে-ব্যাপারটি এবার ছকে-ছকে মিলে যাচ্ছে : চিত্রটিতে আর ফাঁক নাই। এবার যুবক শিক্ষক শুধু যে দেহটি নদীতে ফেলার সিদ্ধান্তের কারণ বোঝে তা নয়, কাদের কেন তার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল সে-কথাও সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে। একজন মানুষের সাহায্যের তার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল বইকি। যুবতী নারী মৃত হলেও তার দেহটি অতি প্রিয়। একাকী তা বহন করার চেষ্টা করলে তার অযত্ন-অসম্মান হত, দেহটি টানা-হ্যাঁচড়া করতে হত, প্রতি মুহূর্তে এ-কথাও স্মরণ হত যে সে আর জীবিত নাই। কাদেরকে সাহায্য করার সময় যুবক শিক্ষক যেন

BanglaBook.org

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এখন ঘোর অন্ধকার থেকে কাদেরের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। বারে বারে সে কি তাকে সাবধান হতে বলে নাই? এত সাবধানতার অর্থ কি এই নয় যে, যুবতী নারীর মৃতদেহেও একটু আঁচড় লাগবে তা তার সহ্য হয় নাই? তারপর, নদীর পাড় বেয়ে নাবতে গিয়ে যুবক শিক্ষক হুমড়ি খেয়ে পড়লে, এবং শেষ মুহূর্তে কাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম না হলে, কাদেরের মনে তার প্রতি যে তীব্র ঘৃণা জেগেছিল সে-ঘৃণাও কি যুক্তিটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে না? না, দেহটি তার কাছে অতি প্রিয় মনে না হলে পরের সাহায্য দরকার সে বোধ করত না। শুধু দুষ্কীর্তির প্রমাণ ধ্বংস করতে চাইলে কোনোপ্রকারে নিজেই অপ্রীতিকর কাজটি সম্পন্ন করত।

একটি গভীর স্বস্তিবোধে আপ্লুত হয়ে যুবক শিক্ষক ভাবে, বাঁশঝাড়ের দুর্ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অতিশয় মর্মান্তিক কিন্তু তাতে এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে, জীবন মায়ামমতাশূন্য নিঃসাড় প্রান্তর। দুর্ঘটনাটি অতিশয় শোচনীয়, কিন্তু সেটি মনুষ্যত্ববিবর্জিত নয়। তার বিশ্বাস প্রমাণিত হয়েছে; সে যে একটি অর্থহীন গোয়ার্তুমির জন্যেই কাদেরকে নিষ্ঠুর দুর্বৃত্ত বলে গ্রহণ করতে চায় নাই তা নয়। অবশ্য আজ সকালে ক্ষণকালের জন্যে কাদের সম্বন্ধে সে-অসত্য চিত্রটি সে গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু তার কারণ আকস্মিক আঘাত। আঘাতটি কাটলে কথাটি প্রত্যাখ্যান করতে তার দেরি হয় নাই।

একটি কথা ভেবে যুবক শিক্ষক কিছুটা ক্ষুণ্নই হয়। হত্যার মতো ভীষণ কথাটি কাদের দ্বিধা না করে স্বীকার করেছে, কিন্তু যুবতী নারীর প্রতি তার ভাবাবেগের কথা ইশারা-ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করে নাই। কেন? যে-ভাবাবেগের জন্যে যুবক শিক্ষক তাকে এখন ক্ষমা করতে প্রস্তুত, সে-ভাবাবেগ কি এতই লজ্জাকর যে তার ক্ষীণতম উল্লেখও তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই?

একটু ভেবে সে-বিষয়ে কাদেরের নীরবতার কারণ সে বুঝতে পারে। খাঁটি মানুষ অসঙ্কোচে দোষঘাট স্বীকার করে, কিন্তু হৃদয়ের সৌন্দর্য সহজে উন্মুক্ত করে না। তাছাড়া, সে-কথা যুবক শিক্ষককে বলবে কেন সে? ধরতে গেলে তাকে সে চেনেই না।

অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেছে বলে সূর্যের সোনালি আভা অনুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবু এবার সেদিকে উন্মুক্তদৃষ্টিতে তাকালে যুবক শিক্ষক বিস্মিত হয়। যেন সে ভেবেছিল মেঘাচ্ছাদিত কালো আকাশ দেখবে, কিন্তু দেখে নির্মল আলোর বিচ্ছুরণ। তার মনের তমসা সত্যিই কেটেছে।

সে-আলোর দিকে তাকিয়ে শীঘ্র যুবক শিক্ষক একটি মিষ্টি-মধুর চিত্র দেখে।

কাদের বলেছিল, আশ্বিন মাস। হয়তো আশ্বিনের প্রথমাংশ, ভাপসা গরমটা তখনো কাটে নাই। নদীতে ভরা যৌবন, খাল-বিল-পুকুরও কানায়-কানায় ভরা। ছায়াশীতল পুকুরটির একটি পাড় কেমন উঁচু, যেন উদ্ধতভাবে ঘাড় তুলে দাঁড়িয়ে। সেখানে বসে কাদের। সামনে তেল-চকচকে মসৃণ ছিপ, অদূরে শান্ত পানিতে ফাত্‌নাটি স্থির হয়ে আছে। হয়তো পুকুরের অন্যধারে পানিতে ঝুলে-থাকা বৃক্ষশাখায় একটি মাছরাঙাও নিশ্চল হয়ে বসে। রৌদ্রতপ্ত আকাশে চিল ওড়ে।

ফাত্‌নার মতো আর মাছরাঙার মতো কাদেরও নিশ্চল হয়ে বসে। তার চোখ অর্ধনিমীলিত। কিন্তু তাতে কোনো নিদ্রালস ভাব নাই। থেকে থেকে কেমন একদৃষ্টিতে পুকুরের অন্যদিকে সে তাকায়। সেখানে একটি যুবতী নারী দেহ-নিমজ্জিত করে অলসভাবে পানির শীতলতা উপভোগ করে। তার সিক্ত কালো চুলে প্রখর সূর্যের প্রতিফলন, পাশে একটা লাল রঙের আঁচল ভাসে। কাদেরের দিকে সে পেছন দিয়ে থাকে বলে তার মুখটা দেখা যায় না। কিন্তু কখনো-কখনো সে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে কাদেরের দিকে তাকায়। চকিতে-দেখা তার মুখের পাশটা আর তার নীরব কটাক্ষ কাদেরকে প্রতিবার গভীরভাবে বিচলিত করে। যুবতী নারীর যৌবনদীপ্ত মুখে এখনো কৈশোরের সজীবতা, আকর্ষণময় চেহারায় নির্মল সরলতা।

তারপর যুবতী নারী অনেকক্ষণ মুখ ফেরায় না। পানির তলে ধীরে ধীরে সে চক্রাকারে

BanglaBook.org

হাত নাড়ে, তাতে অতি সামান্য ঢেউ ওঠে। তাছাড়া সে স্থির হয়ে থাকে, ফাত্‌নার মতো, শাখায় মাছরাঙার মতো, কাদেরের মতো। তারপর যুবতী নারীর মুখটি দেখবার জন্যে কাদেরের মনে একটি বাসনা জাগে। সে-বাসনা ক্রমশ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে মনে হয় উত্তপ্ত আকাশে রঙ-পরিবর্তন হয়, দিগন্তরেখায় স্বপ্নের কুয়াশা জাগে। কাদেরের অর্ধনিমীলিত চোখে ভাবাবেশ। এক সময়ে ভীষণভাবে ফাত্‌না নড়ে, কিন্তু সেদিকে তার দৃষ্টি যায় না। যুবতী নারী আর তাকায় না কেন? মাছরাঙাও নিঝুম হয়ে বসে অপেক্ষা করে।

যুবক শিক্ষক থামে। চিত্রটি তার মনঃপূত হয় না। যুবতী নারীর বাড়ির পেছনে পুকুরটা সে দেখে নাই। কিন্তু সেখানে কাদের মাছ ধরতে বসতে পারে তা সম্ভব মনে হয় না। সে-চিত্রে খুঁত।

কিন্তু তাদের প্রথম সাক্ষাতের চিত্র কল্পনা করার চেষ্টা করছে কেন সে? তাতে তার লাভ কী? আশ্বিন মাসে একদিন কোনোপ্রকারে তাদের মধ্যে দেখা হয়, তারপর তাদের মধ্যে ভাবাবেগ অনুরাগের সৃষ্টি হয় : তার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। নিজেকে সংযত করে প্লুতগতি কল্পনার রাশ ধরে।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। নিজেরই অজান্তে আশ্বিনের একটি রৌদ্র-দগ্ধ অপরাহ্নের চিত্র আবার তার মনে ভেসে ওঠে। না, কাদের পুকুরপাড়ে বসে নাই। ছিপ হাতে সে তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ পুকুরের বিপরীত অংশে স্নানরতা একটি যুবতী নারীকে দেখতে পায়। তার কালো চুলে রোদ ঝিকমিক করে, মুখটা বাষ্পাবৃত বলে তাতে বিচিত্র আকর্ষণ। থমকে দাঁড়িয়ে সে তার দিকে তাকায়। যুবতী নারীও তার দিকে তাকায়; সরল দৃষ্টিতে হয়তো একটু বিস্ময় কিন্তু কোনো নির্লজ্জতার আভাস নাই। তারপর হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে ওঠে, মুখে তার রঙ ধরে। কী বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে দু-একবার কাদেরের দিকে তাকায়, তারপর তাড়াতাড়ি পুকর থেকে উঠে সে ঘরে ফিরে যায়। চিকন শরীর, পিঠভরা কালো চুল, পরনে লাল শাড়ি। পদক্ষেপ দ্রুত হলেও জড়ানো। অদৃশ্য হবার আগে সে আরেকবার কাদেরের দিকে তাকায়। এবার দৃষ্টিতে কেমন সলজ্জিত আকাঙ্ক্ষার আভাস।

কিন্তু যুবক শিক্ষক নিজেই কি এমন একটি দৃশ্য কোথাও দেখে নাই? মনের অতল গহ্বর থেকে হঠাৎ একটি চেহারা ভেসে ওঠে। তেমনি চুল, তেমনি বাষ্পাবৃত মুখ, চোখে একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা। তেমনি শরীর, পরনে তেমনি লালপেড়ে শাড়িও। মনে পড়ে, সেদিন যুবক শিক্ষকের অন্তরে যে-বিচিত্র ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় তাতে সে প্রথমে অভিভূত হয়ে পড়ে। তারপর একটি অজানা ভয় এসে তাকে গ্রাস করে। মেঘশূন্য আকাশে যেন অদৃশ্য ঝড় উঠেছে : ভয়েরই কথা। কিন্তু যে-ঝড়ের নাম জানা নাই, যে-ঝড়কে দেখা যায় না, সে-ঝড়কে চেপে রাখতে হয়। সে-ঝড় তার মনে আর প্রত্যাবর্তন করে নাই।

কাদের হয়তো সে-ঝড়ে ভীত হয় নাই, তাকে থামাবার চেষ্টাও করে নাই। হয়তো যুবক শিক্ষকের মতোই তার অর্থ সে বোঝে নাই, কিন্তু তার মতো সে-ঝড় দমাবার চেষ্টা না করে বরঞ্চ তার মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করে। যুবতী নারীকে কী একটা কথা বলার তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করে যার অর্থ সে নিজেই বোঝে না। সে-কথা যেন ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ব্যক্ত করতে পারলেও কথাটি বলা নিষেধ। যে-কথা আকাশের সূর্যচন্দ্রতারা, ধরণীর ফুললতাপাতা-দূর্বাদল বা স্রোতস্বিনী নদী নির্বিঘ্নে বলতে পারে সে-কথা বলা নিষেধ। যে-কথা হয়তো জীবন সম্বন্ধে একটি সরল কৌতূহল মাত্র, যার উৎস অজানার প্রতি মানুষের ভীতির মধ্যে, সে-কথা বলা নিষেধ। বললে ভীষণ পরিণাম নিশ্চিত : নদী নির্ধারিত ধারা পরিত্যাগ করে হয়তো মহাপ্লাবন সৃষ্টি করবে, নক্ষত্রপুঞ্জ কক্ষচ্যুত হয়ে প্রলয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা বিস্তার করবে, সূর্য আর উদয় হবে না। সে-ভয়াবহ সম্ভাবনায় কে না ভীত হয়? তবু ভীত না হয়ে কাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে চেয়েছিল।

BanglaBook.org

কিন্তু তার দুঃসাহসের ফল তাকে ভোগ করতে হয়েছে। সে-নিষেধাজ্ঞা খণ্ডনীয় নয়; একবার খণ্ডন করলে ক্ষমা নাই। পরিণামের কথা যখন বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো তার স্মরণ হয় তখন দিশেহারা হয়ে যাকে সে একটি দুর্বোধ্য কথা বলবার জন্যে এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তাকেই আপন হাতে সে হত্যা করে। তার কঠোর শাস্তি : আমৃত্যু শোকাকুল অনুতাপ। সে-অনুতাপের অসহনীয় জ্বালা কখনো প্রশমিত হবে না।

যুবতী নারীর প্রতি তার ভাবাবেগ ন্যায়সঙ্গত নয় সে-কথা যুবক শিক্ষক উপলব্ধি করে। কিন্তু তার জন্যে সে চূড়ান্ত শাস্তি লাভ করে নাই কি? এরপর আর কোনো শাস্তির কথা উঠতে পারে না। অন্যায়ের তুলনায় শাস্তিটি অতি কঠোর বলে তার প্রতি মানুষের সমবেদনা হওয়াই স্বাভাবিক।

একটি বিষয়ে যুবক শিক্ষকের মনে কোনো সন্দেহ নাই। সে যে-উত্তর পেয়েছে সে-উত্তরে সে সন্তুষ্ট। অন্যায় হোক, তবু যুবতী নারীর প্রতি কাদেরের মনে মায়ামমতা ভাবাবেগ ছিল। বাঁশঝাড়ের দুর্ঘটনাটি তাই নির্দয় নির্মম হত্যাকাণ্ড নয়।

বাড়ি ফেরবার পথে যুবক শিক্ষকের তৃপ্ত-মনে হঠাৎ অপ্রীতিকর একটি সন্দেহের ছায়া উপস্থিত হয়। যুবতী নারীর হত্যাকারী কে, সে নিজেই নয়? সে যদি কাদেরকে অনুসরণ না করত, অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অকারণে বাঁশঝাড়ের সামনে উপস্থিত না হত, তবে দুর্ঘটনাটি ঘটত না।

একটু ভেবে সে নিজেকে দোষমুক্ত করে। এ-কথা সত্য যে বাঁশঝাড়ে সে উপস্থিত না হলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটত না, কিন্তু অন্যদিন অন্যখানে অন্য কোনোপ্রকারে হয়তো এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হত। আসল হত্যাকারী সে নয়, কাদেরের মনের গভীর ভীতি। সে-ভীতির মূলে সিন্দুকে লুকানো তোস্‌তারী কিংখাব হতে শুরু করে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা। সে-সব নিষেধাজ্ঞার যথার্থতা বিচার করার ক্ষমতা তার নাই, তা বিচার করে দেখতেও সে চায় না। তার প্রশ্ন কাদেরের হৃদয় সম্বন্ধে। কাদের তার চোখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

বাড়ি পৌঁছবার আগে যুবক শিক্ষক একটি বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তার চোখে কাদের যখন দোষমুক্ত হয়েছে তখন বাঁশঝাড়ের কথাটি আর প্রকাশ করার কথা ওঠে না। তার মুখ থেকে কথাটি কেউ জানতে পারবে না। অবশ্য দাদাসাহেবকে একটি কথা বলবে বলে সে ওয়াদা দিয়েছে। তাঁকে কী বলবে? সে কিছু ভাবিত হয়। সে বুঝতে পারে, তাঁকে আজেবাজে কোনো কথা বলে সে নিস্তার পাবে না। কী বলবে তাঁকে?

তার বর্তমান স্বস্তিভরা মনের পক্ষে বেশি চিন্তা করা সম্ভব হয় না। তাই হয়তো সহসা সে ভাবে, তাঁকে বলবে কাদের দরবেশ। তিনি খুশি হবেন, কারো কোনো ক্ষতিও হবে না।

তাছাড়া, কে দরবেশ কে দরবেশ নয়, সে-কথা কি কেউ কখনো সঠিকভাবে বলতে পারে?

এগার

কাদের তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। যুবক শিক্ষক ঘরে প্রবেশ করলে সে এক পলকের জন্যে তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। জানালাটি বন্ধ বলে ঘরে আবছা অন্ধকার। সে-জন্যে তার চেহারা ভালো করে দেখা না গেলেও যুবক শিক্ষক তাতে কেমন স্তব্ধতা অনুভব করে।

একটু ইতস্তত করে যুবক শিক্ষক টেবিলের পাশের ছোট নড়বড়ে চেয়ারটি টেনে নিঃশব্দে সোজা হয়ে বসে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আপনা থেকেই খোশ-মেজাজে ঘোষণা করে, ''একটু বেড়িয়ে এলাম।''

কাদের এবারও কিছু বলে না। একটু পরে যুবক শিক্ষক সংগোপনে তার দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

কাদেরের মুখটা সামান্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাতে নিঃসন্দেহে স্তব্ধভাব। তারপর সে তার অর্ধনিমীলিত চোখের দিকে তাকায়। সে-চোখের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক হঠাৎ যেন তার অর্থ বুঝতে পারে। সে-চোখ এ-দুনিয়া সে-দুনিয়া, এপার-ওপার দু-দুনিয়া দু-পারই দেখে। জেগে থেকেও কাদের ঘুমিয়ে, ঘুমিয়েও সে জেগে। তার রাতে সূর্য অস্ত যায় না, আবার প্রখর সূর্যলোকে রাতের অবসান হয় না। তার দৃষ্টি অস্তিত্বের এমনই একটি ক্ষেত্রে নিবদ্ধ যেখানে জীবনমৃত্যুর মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই, যেখানে দুটিই যুগপৎ সত্য, দুটিই একত্রে বিরাজ করে। বিস্ময় কি যে কাদেরকে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই অবাস্তব জগতে প্রবেশ করেছিল।

যুবক শিক্ষক কাদেরকে দেখে খুশিই হয়েছিল। তাকে তার শেষ প্রশ্নটি করা বাকি। কিন্তু এবার তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, আর প্রশ্নের কী দরকার? মনের অশান্তি কেটেছে। তার জীবনে যে-ফাটল ধরেছিল, সে-ফাটলে আবার জোড়া লেগেছে। কেন সে তাকে ব্যস্ত করবে?

আবার সে অনেকটা অকারণে বলে, "নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে এলাম।"

কাদের পূর্ববৎ নির্বাক থাকে। কিন্তু নদীর কথায় তার চোখে যেন ঈষৎ কম্পন দেখা যায়।

না, তবু তাকে প্রশ্নটি করতে হবে। তার শেষ প্রশ্ন। সে-প্রশ্নের পরেই কাদের খালাস পাবে। সন্তোষজনক উত্তর পাবে তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কথাটি মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত সে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে না। সে কি একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নেয় নাই? মায়ামমতার কারণেই সে তাকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করবে—এ-সিদ্ধান্তের অর্থ কি এই নয় যে, সে নিজেকে নিজেই বিচারকের পদে নিযুক্ত করেছে? কে সে? একজন দরিদ্র শিক্ষক মাত্র, শিক্ষকতা করলেও যার জ্ঞানবুদ্ধি-অভিজ্ঞতা নেহাৎই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, অন্যদিক থেকে কথাটা ভেবে দেখলে এই মনে হয় না কি যে, দায়িত্বটি গ্রহণ করে খোদার চেয়ে বান্দাকেই সে বড় করে দেখছে? স্রষ্টার চোখে তাঁরই সৃষ্ট মানুষের প্রাণহরণ অতীব জঘন্য অপরাধ। সে-অপরাধের গুরুত্ব তিনিই সম্যকভাবে নির্ণয় করতে পারেন, তিনিই কেবল বলতে পারেন কোনো মানুষের অন্তরে কতখানি দয়ামায়া, কতখানি নির্দয়তা। যে-কথা যুবক শিক্ষক কাদেরের বিবৃতিতে এবং আচরণে সাব্যস্ত করবে, সে-কথা তার কাছে বিনা চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে। যুবক শিক্ষক কি বিশ্বাসী নয়?

শেষোক্ত প্রশ্নটি তাকে বিচলিত করে। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, এ-প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারবে না।

নিশ্চিত জয়ের সামনে দাঁড়াবার পর আকস্মিকভাবে এবং অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে একটি দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা এসে হাজির হলে মনে ক্ষোভদুঃখের সৃষ্টি হয়। সে-ক্ষোভদুঃখ সাময়িক বিহ্বলতা আনলেও পরে আবার যে-কোনো প্রকারে বাধাটি অতিক্রম করার জন্যে একটি অন্ধ জিদ চাপে, মানুষ মরিয়া-হয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষকের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় এই ভেবে যে, দুর্বহপ্রায় যে-দায়িত্বটি সে গ্রহণ করেছে এবং যে-দায়িত্ব সে কৃতকার্যতার সঙ্গে প্রতিপালন করতে পারবে বলে তার বিশ্বাস, সে-দায়িত্বটি যেন হাত থেকে শেষ মুহূর্তে খসে যাবে। কিন্তু এখন দায়িত্বটি ছাড়তে সে রাজি নয়।

না, সে অবিশ্বাসী নয়, কারণ বিশ্বাসী হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে সে এ-বিষয়ে সজ্ঞান যে, তার বিশ্বাসটি প্রশ্নহীন। যেখানে বিশ্বাসটি থামে তার ওধারে কী আছে সে জানে না। সে-কথা তার জানবার ক্ষমতা নাই, জানবার চেষ্টাও সে করে না। কেন করবে? অন্ধবিশ্বাস দাবি করে দৃষ্টিশক্তি আশা করা অনুচিত। কিন্তু যে-ক্ষুদ্র জগতে মানুষ বিচরণ করে সে-জগতের কোথায় ভালো কোথায় খারাপ সে-কথা বিচার করার ক্ষমতা মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া উচিত নয়। সে-ক্ষমতাটুকু হারালে মানুষ অতিশয় সীমাবদ্ধ প্রাণীতে পরিণত হবে। যুবক শিক্ষক কী চায়? সে চায় একটি কথা বিচার করতে : কাদের মানুষ কি অমানুষ,

BanglaBoi.org

তার হৃদয়ে ভালবাসা–দয়ামায়ামমতা আছে, না তাতে কেবল নির্দয়তা। মানুষের কর্তব্য মানুষকে ভালবাসা, তার সঙ্গে স্নেহের নীড় বাঁধা, তাকে বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা করা। সে-বিষয়ে কে সফল হয়েছে কে হয় নাই, সে–কথা মানুষই বিচার করবে, কারণ মানুষের ভালোমন্দে মানুষেরই লাভ–লোকসান। যুবক শিক্ষক এ–কথা জিজ্ঞাসা করছে না সৃষ্টিকর্তা কেন কাউকে ভালো করেন কাউকে খারাপ করেন : তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য সে বোঝে না। সে শুধু মানুষের ভালোমন্দ বিচারের অধিকার চায়।

হঠাৎ সভয়ে যুবক শিক্ষক ভাবে, এমন সব কথা সে কখনো ভাবে নাই। সে কি পাগল হয়েছে? বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি কি তার মস্তিষ্কবিভ্রান্তি ঘটিয়েছে?

কিন্তু অপরপক্ষকে শান্ত করবার জন্যেই যেন প্রশ্নটি তোলে। তার যুক্তির জন্যে সে মনে কোনো অনুশোচনা বোধ করে না।

আর ভাববার সময়ও পায় না। হঠাৎ কাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তার দিকে তাকায়। কাদেরের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। সে–দৃষ্টিতে কেমন যেন সন্দেহ। চোখাচোখি হতেই সে চাপা, খন্‌খনে গলায় প্রশ্ন করে, "কী অত চিন্তা করেন?"

উত্তর না দিয়ে যুবক শিক্ষক একটু হাসবার চেষ্টা করে, কিন্তু সামান্য মুখব্যাদান করে নিরস্ত হয়। তারপর তার দিকে না তাকিয়ে আস্তে বলে, "এসেছেন, ভালোই হয়েছে। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

সূর্যাস্তের দেরি নাই। উঠানে যে–অংশটি দৃষ্টিগত হয় সেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দুটি গরু, তারপর একটি রাখালমানুষকে দেখা যায়। হঠাৎ যুবক শিক্ষকের সন্দেহ হয়, প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার জন্যে সময়টি কি উপযুক্ত? কিন্তু তার সময় নাই। দাদাসাহেবকে একটা উত্তর দিতে হবে। তাছাড়া, উত্তরটি জানবার জন্যে তার মনেও ঔৎসুক্য কম নয়। তবু মনে দ্বিধা হয়। উত্তরটি যে সুখবর হবে তা জেনেও প্রশ্নটি করতে তার ভয় হয়। কয়েক মুহূর্ত সে নিশ্বাস বন্ধ করে রাখে। তারপর সে ভাবে, তার বিশ্বাসটি যদি অসত্য প্রমাণিত হয়, তবে বাইরের পৃথিবীই ধূলিসাৎ হবে, তার কোনো ক্ষতি হবে না; সে–ধ্বংসলীলা তার চুল পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না। তারপর তার চিকন নাসারন্ধ্র যেন সতর্কিতভাবে কেঁপে ওঠে। নিঃশব্দে সে নিশ্বাস নেয়, শূন্য বুক ভরে ওঠে।

"একটা কথা জানা বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

কাদের নীরব হয়ে থাকে। তার নীরবতায় যুবক শিক্ষক কিছুটা দমিত হয়। কাদের যদি একবার জিজ্ঞাসা করত কী সে–কথা যা যুবক শিক্ষকের জানা বড় প্রয়োজন, তবে আপনা থেকেই প্রশ্নটি বেরিয়ে আসত। জিহ্বার ডগায় সে–প্রশ্ন , সামান্য পালকস্পর্শই যথেষ্ট।

কাদেরের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করে, "আপনি কেন এসেছেন?"

কাদের অর্ধনিমীলিত চোখে প্রশ্নটা ভেবে দেখে। তারপর চোখ বন্ধ করে বলে, "আপনার কথাই বলেন।"

তার কণ্ঠের আওয়াজে কেমন প্রশ্রয়ের আভাস। কিন্তু মনে হয়, চোখ বন্ধ করেও সে যেন স্থির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে যুবক শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে আছে, তার কথা শোনবার জন্যে কানও খাড়া করে রেখেছে। সে যেন আজ দু–জগতের বাসিন্দা আর নয়। মুহূর্তের জন্যে যুবক শিক্ষকের মনে ভয়ের আবির্ভাব হয়। সে ভাবে, তার মাথায় এ কী অদ্ভুত খেয়াল জন্মেছে? কেন সে কাদেরকে প্রশ্ন করতে চায়? অকস্মাৎ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটিই যেন অর্থহীন মূল্যহীন মনে হয়, তার সত্যাসত্য বিচার করার কথাও নিতান্ত অহেতুক মনে হয়। তবু একটা হদিস পাবার আশায় সে কাদেরের দিকে তাকায়। তার চোখ পূর্ববৎ নিমীলিত, সারা শরীরে পাথরের মতো নিশ্চলতা। এবার যুবক শিক্ষকের মনে হয়, সে–নিশ্চলতার সামনে বেশিক্ষণ সে স্থির হয়ে থাকতে পারবে না, হঠাৎ একটা দুর্বার স্রোত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কাদের কিছু বলে না কেন? তার মনেও কি একটি নিদারুণ ভয় উপস্থিত হয়েছে? প্রশ্ন করতে

Banglabooks.org

যুবক শিক্ষকের মনে যেমন ভয়, প্রশ্ন শুনতেও তার মনে কি তেমনি ভয়? দু-জনের মনেই ভয়। তবে একই ভয় : দু-ভয়ে কোনো তারতম্য নাই। তাদের পক্ষে পরস্পরকে সাহায্য করা সম্ভব নয় কি?

একটা গভীর নিঃসঙ্গতাবোধে নিঃসাড় হয়ে থেকে কাদেরের মতো সেও চোখ নিমীলিত করে। এবার চারধারে ঘন-কালো অন্ধকার জাগে, নীরবতাও যেন নিবিড় হয়ে ওঠে। সে ভাবে, তারা আক্রমণ-উদ্যত শত্রু নয়, বন্ধু। তবে দু-জনেই নিঃসঙ্গ, কী একটা প্রশ্নের জন্যে ঘনতমসার মধ্যে হাতড়িয়ে ফিরছে। যা খুঁজছে তা না পেলেও তারা যদি পরস্পরের হাত ধরতে পারে, শুধু একটু সময়ের জন্যে, একটি মুহূর্তের জন্যে, তবে ক্ষীণতম হলেও তবু তারা একটা আলো দেখতে পেত।

যুবক শিক্ষকের ঠোঁটটা একটু কেঁপে ওঠে। কেন কথা বলছে সে-কথা বুঝতে না পারলেও ঘন অন্ধকারের মধ্যে সে এবার বলে, "আপনি সব কথাই বলেছেন কিন্তু একটা কথা বলেন নাই।"

কাদের উত্তর দেয় না। কিন্তু যুবক শিক্ষক কোনো উত্তর বা উক্তির জন্যে অপেক্ষা করে না। আবার বলে, "কথাটা কী করে বলি?" মুখটা তার সামান্য লাল হয়ে ওঠে। তারপর সে বলেই ফেলে, "যুবতী নারীর প্রতি আপনার মায়ামমতার কথা বলেন নাই।"

কথাটা সে অবশেষে বলেছে। কেমন অসংলগ্ন শোনায়, কিন্তু ঘনতমসার মধ্যে কোন কথা অসংলগ্ন শোনায় না? যুবক শিক্ষক স্থির হয়ে থাকে। তারপর সে অপেক্ষা করে। অন্ধকারটা হাল্কা হয়ে উঠেছে, শীঘ্র সে যেন আলোতে ভেসে উঠবে, আবার চাঁদ-তারা আকাশ দেখতে পাবে। কোনো উত্তর না পেলে সে এবার চোখ খুলে তাকায়। অদূরে ছায়াটি এখনো নিশ্চল হয়ে আছে।

কাদেরের চোখ উন্মুক্ত। সে তারই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে কেন? হয়তো তার দৃষ্টি এড়াবার জন্যেই সে এবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, "দাঁড়ান, আলো জ্বালাই।" তারপর লণ্ঠন জ্বালানোর কাজে মনোনিবেশ করে সে বলে, "বুঝলেন আমার কথাটা?" কাদেরের দিকে তাকাতে তার আর সাহস হয় না, একটা গভীর লজ্জা এসে তাকে গ্রাস করে। লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে সেটি দরজার এক পাশে ঠেলে দেয়, কাদেরের সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয়ে তা টেবিলে রাখতে পারে না। তারপর সে চেয়ারে ফিরে এসে কাদেরের দিকে পাশ দিয়ে বসে।

অবশেষে কাদেরের কণ্ঠ শোনা যায়। সে-কণ্ঠে গভীর বিস্ময় না সন্দেহ তা যুবক শিক্ষক ধরতে পারে না। সে আস্তে প্রশ্ন করে, "আপনার মতলব কী?"

এ-প্রশ্নটি কাদের সকালেও তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তখন প্রশ্নটি তাকে আঘাত দিয়েছিল। এখন সে তাতে আঘাত পায় না। বরঞ্চ সে ভাবে, সকালে কাদেরের সামনে যে-ভাবে সে আচরণ করেছিল, তারপর তার মনে এ-বিশ্বাসই হওয়া স্বাভাবিক যে তার প্রতি যুবক শিক্ষকের কোনো সহৃদয়তা নাই। যুবক শিক্ষকের মনে যে একটা পরিবর্তন এসেছে তা সে কী করে বুঝবে?

"না, আমার কোনো কু-মতলব নাই।" আবার সে একবার হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। "আমার কথাটি বুঝতে পারছেন না কেন?"

"কথাটা কী?"

"একটা দুর্ঘটনার কথাই আপনি শুধু বলেছেন। আর কিছু বলেন নাই।"

কাদের তার কথা এখনো বুঝতে পারে নাই। একটু থেমে আবার প্রশ্ন করে, "আর কী বলব?"

"বললাম না?"

"কী বললেন?"

BanglaBook.org

যুবক শিক্ষকের মনে হয় আবার সে একটি ফাঁদে পড়েছে : এ-ফাঁদ অতীব বাস্তব, অতীব সত্য। তার মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করে।

"বললাম তো! মেয়েলোকটির জন্যে আপনার মায়ামহব্বত ছিল সে-কথা একবারও বলেন নাই।"

এবার কথাটা বোধগম্য হয়েছে কিনা তাই দেখবার জন্যে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে সে একবার কাদেরের দিকে তাকায়। যা দেখে তাতে প্রথমে তার বিস্ময় হয়, তারপর ভয়। কাদেরের চোখ সম্পূর্ণভাবে খোলা : সে যেন কী একটা কথা বুঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারপর সে-চোখ ঘোলাটে হয়ে ওঠে, তাতে শেষে রক্তাভা দেখা দেয়।

শুষ্ককণ্ঠে যুবক শিক্ষক প্রশ্ন করে, "কী ব্যাপার?"

কাদের উত্তর দেয় না। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় কিন্তু তার চোখে রক্তাভা ক্রমশ আরো গাঢ় হয়। তিল-তিল করে তাতে যেন রক্তবিন্দু জমছে। অবশেষে তার দৃষ্টি ঘরময় ঘুরতে থাকে। সে যেন কী সন্ধান করে, কী যেন বুঝতে চায়। এখানে-সেখানে সে-দৃষ্টি থামে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে, তারপর এক সময় আলগোছে যুবক শিক্ষকের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। একবার, দু-বার। তাকে দেখেও দেখে না, তবু তার ওপর দিয়ে যখন বয়ে যায়, তখন তার দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যে কেমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষক বোধ করে, তার ভেতরটা হঠাৎ শীতল হয়ে উঠছে। অধীর হয়ে সে বলে, "সত্যি কিনা বলেন। হাঁ-না কিছু বলেন।"

কোনো উত্তরই আসে না। তারপর যুবক শিক্ষকের মনে হয়, ক্ষুদ্র ঘরটা যেন চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সেও ঘুরতে শুরু করে। তার মাথাটা শূন্য হয়ে ওঠে, তারপর দপদপ করে। একটা অকথ্য জ্বালায় সারা শরীরে যন্ত্রণাও জাগে। লোমশ বিষাক্ত বিচ্ছু গায়ে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে; হাতে, পায়ে। তারপর সমগ্র দেহে। কিন্তু সে কিছু পরওয়া করে না। তার দৃষ্টি কাদেরের ওপর নিবদ্ধ। চতুর্দিকে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কাদেরই যেন কেবল স্থির হয়ে আছে। না, তার রক্তাক্ত স্ফীতমস্ত চোখ দুটি ঘোরে, কেবল ঘোরে, চক্রাকারে এবং অন্তহীনভাবে।

তারপর যুবক শিক্ষকের মনে হয়, সে যেন দ্রুতভাবে কথা বলতে শুরু করেছে। গলা অনুচ্চ হলেও নিজেরই কানে তার স্বর অস্বাভাবিক ঠেকে, বিষয়বস্তুও ঠিক বোধগম্য হয় না। কেবল ক্ষিপ্রগতিতে অস্পষ্ট শব্দগুলি মুখ থেকে বেরিয়ে চতুর্দিকে ছিট্‌কে পড়ে, একটার পর একটা, কোথাও জোড়া লাগে না, কোথাও বিদ্ধ হয় না। তাতে সে দমে না। শব্দগুলি সে ছুঁড়তেই থাকে, পাগল মানুষ যেমন ঢিল-পাথরের স্তূপ পেয়ে অশ্রান্তভাবে লক্ষ্যহীনভাবে তা ছুঁড়তে থাকে চতুর্দিকে। তারপর এক সময় হয়তো তার কথার উৎস শুকিয়ে আসে। কারণ তার মনে হয় সে একটি কথাই বারবার বলছে, একটি ঢিলই ছুঁড়ছে। কিন্তু ছুঁড়তেই আবার সেটা হাতে ফিরে আসে বা হাত থেকে বেরিয়েও হাতেই থেকে যায়।

"বুঝলেন কথাটা কেন দরকারি? বুঝলেন, বুঝলেন?"

সে কোনোই উত্তর পায় না। তারপর ঘূর্ণ্যমান ঘরটি ধীর স্থির হয়, একটা নিঃস্ব তবু প্রীতিকর নীরবতা ফিরে আসে।

অবশেষে কাদেরের কণ্ঠ শোনা যায়। সে কণ্ঠে ঘৃণা, বিস্ময়। শুধু তাই নয়। সে একটি অদ্ভুত কথা বলে। প্রথমে কথাটি বুঝতে পারে না যুবক শিক্ষক। কিন্তু কাদেরের কণ্ঠ যখন নীরব হয় তখন নীরবতার মধ্যেও তার কথাটি শুনতে পায় বার-বার। অতি বিস্ময়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, সে পাগল? কাদের যেন তাই বলল।

তারপর কাদের তাকে ভয়-প্রদর্শন করে। যুবক শিক্ষক সুস্থমস্তিষ্ক নয় কথাটি আবিষ্কার করেছে বলেই সে যেন ভয়-প্রদর্শন করার প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু কাদেরের উক্তিটি তাকে স্পর্শ করে না। তার মন অন্যত্র। কেবল সে একাধিকবার বলা কথাটি আবার বলবার জন্যে তীব্র ইচ্ছা বোধ করে বলে সেটি শেষবারের মতো শূন্যতায় নিক্ষেপ করে, নিরাশভাবে, পূর্ববৎ

banglabook.org

লক্ষ্যহীনভাবে।

"আমার কথাটা এখনো বুঝলেন না?"

কাদের কোনো উত্তর দেয় না। যুবক শিক্ষকের প্রশ্নটি নিস্তব্ধ ঘরে কতক্ষণ বিসদৃশভাবে ঝুলে থাকে, তারপর প্রশ্নকারীকেই তা নির্মমভাবে লজ্জা দিতে শুরু করে। সেটি যেন তার প্রশ্ন নয়, তারই উলঙ্গ দেহ। সে-দেহ কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে।

একটি কথা তার কাছে অত্যাশ্চর্য মনে হয়। অনতিদূরে হত্যাকারী সম্পূর্ণভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে সুস্থির হয়ে বসে, কোথাও একটু অসংলগ্নতা নাই।

যুবক শিক্ষক অবশেষে বোঝে, কাদেরের পক্ষে দরিদ্র মাঝির বউ-এর প্রতি কোনো ভাবাবেগ বোধ করা সম্ভব নয়।

তারপর যুবক শিক্ষকের চোখের সামনে একটি ধু-ধু প্রান্তর জেগে ওঠে। সে-প্রান্তর শুধু ধু-ধুই করে, তাতে কোনো মরীচিকা নাই। যে-মরীচিকার পেছনে সে এ-ক'দিন ছুটেছিল, সে-মরীচিকার কোনো আভাস নাই সেখানে।

একটু পরে আপন মনেই শান্তভাবে যুবক শিক্ষক বলে, 'তবে আর কী? সব শেষ হল।"

মরীচিকা যদি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে তবে কাকে দোষ দিতে পারে?

অবশেষে সে কাদেরের দিকে তাকিয়ে বলে, "আমার আর কোনো উপায় থাকল না।"

কাদেরের চোখটা দপ করে জ্বলে ওঠে, ঠোঁটের পাশটা বিকৃত হয়ে ওঠে। কিছু না বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে সে চলে যায়। তার ঘাড়ের একটা দিক অতিশয় উঁচু মনে হয়।

বারো

অবশেষে যুবক শিক্ষকের পক্ষে বাঁশঝাড়ের নির্মম ঘটনাটি নিরপেক্ষ দর্শকের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়। চন্দ্রালোক দিবালোকে পরিণত হয়েছে। সে-দিবালোকে একটি নিহত যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ দেহ স্পষ্টভাবে সে দেখতে পায়। শুধু তাই নয়। হত্যাকারীর পক্ষেও কোথাও গা-ঢাকা দেবার উপায় নাই।

না, ঘটনাটিতে আর কোনো জটিলতা নাই। একসময়ে ফৌজদারি আদালতে বাদীপক্ষ সেটি এ-ভাবেই পেশ করবে তাতে সন্দেহ নাই।

বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বি আলফাজউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠভ্রাতা কাদের চৌধুরী নিষ্কর্মা মানুষ। কয়েক মাস আগে বিবাহিত এবং ভদ্রবংশীয় সে-নিষ্কর্মা মানুষটি তাদের গ্রামেরই একটি দরিদ্র মাঝির সন্তানহীনা যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে কোনো প্রকারে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। কার্যোপলক্ষে স্বামীটিকে প্রায়ই গ্রামছাড়া হতে হয়। তখন ঘরে থাকে তিনজন মেয়েমানুষ : মাঝির স্ত্রী, বৃদ্ধা মা এবং কানা বোন। অবস্থা অনুকূল হলেই কাদের যুবতী নারীর সঙ্গে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করে। মাঝির ঘরটা গ্রামের একপ্রান্তে। নিকটে একটু জঙ্গলের মতো। সেখানে একটা বৃহদাকার বাঁশঝাড়। সে-বাঁশঝাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র খোলা স্থানে তাদের গোপনমিলন হয়। ধর্মনীতিবিরুদ্ধ অবৈধ এ-মিলনের কারণ কী? যুবতী নারী আজ মৃতা। তার মনে কী ছিল তা আজ জানা সম্ভব নয়। তবে তার সঙ্গে কাদেরের সম্পর্কের কারণ নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে-কারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।

দিন-কয়েক পূর্বে বড়বাড়ির আশ্রিত যুবক শিক্ষক আরেফ আলী গভীর রাতে কাদেরকে বাড়ি ত্যাগ করে গ্রাম-অভিমুখে যেতে দেখে। তার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতে সে দরবেশ। কথাটা বিশ্বাস না-হলেও কাদের সম্বন্ধে যুবক শিক্ষক কৌতূহল বোধ করে। সে ভাবে, কাদেরকে অনুসরণ করে দেখে অত রাতে কী উদ্দেশ্যে সে ঘর থেকে বেরিয়েছে। অবশ্য খারাপ কিছু সে সন্দেহ করে না।

BanglaBook.org

শীঘ্র সে কাদেরকে হারিয়ে ফেলে। তারপর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তার কথা ভুলে সে কিছুটা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। হয়তো কাদেরকে আবার দেখতে পাবে সে-আশাটা এখনো সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে নাই। তারপর একসময়ে নদীর কাছে বাঁশঝাড়ের নিকটবর্তী হতেই একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ঠিক চিনতে না পারলেও তার সন্দেহ থাকে না যে কণ্ঠস্বরটি কাদেরেরই। দ্বিতীয় কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে না পেলে তার মনে হয়, কাদের হয়তো অদৃশ্য কোনো আত্মার সঙ্গে কথালাপ করছে। সে কি সত্যই দরবেশ? তার কথা ভালো করে শুনবার জন্যে সে বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। তখন শুকনা পাতায় তার পা পড়লে হঠাৎ আওয়াজ হয়, হয়তো ভয় পেয়ে সে নিজেও কিছু বলে ওঠে। এবার বাঁশঝাড়ে কণ্ঠস্বরটি থেমে যায়। কিছুক্ষণ পর যুবক শিক্ষক আবার রাখালের মতো ডেকে উঠলে যুবতী নারী ভয় পেয়ে সামান্য চিৎকার করে ওঠে।

বাঁশঝাড়ের বাইরে মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলে কাদের ভেবেছিল হয়তো যুবতী নারীর স্বামীই তার স্ত্রীর সন্ধানে এসেছে। এবার যুবতী নারী চিৎকার করে উঠলে সে নিদারুণ ভয়ে দিশেহারা হয়ে যুবতী নারীকে চুপ করাবার জন্যে তার গলা টিপে ধরে। প্রাণের জন্যে যুবতী নারী যতই ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ততই দিশেহারা কাদের তার হস্তবন্ধন শক্ত করে। শীঘ্র যুবতী নারীর জীবনাবসান ঘটে। কাদেরের মতে, সে-নিদারুণ ভীতির কারণ তার পরিবারের নামযশ। সে-পরিবারের মানুষ চরম ব্যভিচারে লিপ্ত তা প্রকাশ পেলে যে-ভয়ানক পরিণাম হবে সে-পরিণামের কথা স্মরণ হওয়াতে তার সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি হঠাৎ লোপ পায়। যখন সে বুঝতে পারে যুবতী নারীর দেহে প্রাণ নাই, তখন সে বাঁশঝাড়ের পেছন দিয়ে পালিয়ে যায়।

তারপর কাদের একটু ভুল করে। কিছুদূরে গিয়ে তার সন্দেহ হয়, হয়তো সবটা কানেরই ভুল। ভুলবশত সে কি এমন গুরুতর কাণ্ড করে বসেছে? তাছাড়া, বাঁশঝাড়ের সামনে কেউ যদি এসেও থাকে, সে যে হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পেরেছে তার প্রমাণ কী? ভাবে, বাঁশঝাড়ের সামনের ভাগটা একবার দেখে এলে ক্ষতি কী! ফলে যুবক শিক্ষকের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে-রাতে তার বিচিত্র আচরণ দেখে তার মনে সন্দেহ থাকে না যে, সে যে শুধু মৃত নারীর কথা জানে তা নয়, হত্যাকারী কে তাও সে জানে। যুবক শিক্ষক যে কিছু দেখে নাই, কাদের যে হত্যাকারী সেটা যে কেবল তার একটি খেয়াল, সে-কথা বোঝা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

পরদিন যুবক শিক্ষক ঘটনাটি প্রকাশ করবে সে-কথাই কাদেরের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। তবে সে বুঝতে পারে, সাক্ষীর অভাবে অভিযোগটা প্রমাণ করা তার পক্ষে সহজ হবে না। একটি মানুষের বিরুদ্ধে আরেকটি মানুষের কথা। অতএব যুবক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনার জন্যে সে তৈরি হয়ে থাকে। সে বোঝে, প্রথমে যে-অভিযোগটি আনবে তারই অপেক্ষাকৃত বেশি লাভ থাকবে কিন্তু নিজে অপরাধী বলেই হয়তো তার পক্ষে আক্রমণটা শুরু করা সম্ভব হয় না। যুবক শিক্ষক কথাটি প্রকাশ করলে সে কী-পাল্টা জবাব দেবে তা সে ঠিক করে রাখে। সে বলবে, মৃতদেহটি সে স্বচক্ষে দেখেছে এবং যুবক শিক্ষককেও বাঁশঝাড়ের কাছাকাছি দেখেছে। অবশ্য যুবক শিক্ষকই যে হত্যাকারী সে কথা সে সরাসরি না বললেও তার ওপর সন্দেহ ফেলতে দেরি হবে না। তাছাড়া, তার দরবেশী সুনামের জন্যে সে রাতভ্রমণেরও একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবে। উপরন্তু, তার পরিবারের নামযশ প্রতিপত্তিও তাকে সাহায্য করবে।

তাকে কিছুই করতে হয় নাই। পরদিন যুবক শিক্ষক নিয়মিতভাবে বড়বাড়িতে এবং ইস্কুলে শিক্ষকতা করে, রাত্রির ঘটনা কাউকে বলে না। তার ব্যবহারে কাদের বিস্মিতই হয়। তারপর তার নীরবতার একটি কারণই সে দেখতে পায়। যুবক শিক্ষকই তাদের আশ্রিত বলে চক্ষুলজ্জার জন্যেই হোক বা সাহসের অভাবেই হোক, সে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করেছে।

BanglaBook.org

হত্যাকাণ্ডটি প্রকাশ পায় নাই সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলে এবার কাদেরের মন বাঁশঝাড়ে পরিত্যক্ত মৃতদেহটির প্রতি যায়। রাত্রি হলে সে বুঝতে পারে, যুবক শিক্ষক তো কথাটি বলেই নাই, মৃত দেহটিও এ-পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়েছে। সেটা তার কাছে অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার বলেই মনে হয়। তবে সে এ-কথা উপলব্ধি করে যে, প্রথম দিন যে-কোনো কারণে তার প্রতি ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন থেকেছে, দ্বিতীয় দিনেও এমন সুপ্রসন্নতা আশা করা বাড়াবাড়ি হবে। নিখোঁজ নারীর সন্ধান চলছে, দেহটি আবিষ্কার করতে দেরি হবে না। স্থিরমস্তিষ্কে ব্যাপারটি বিবেচনা করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দেহটি অদৃশ্য হয়ে গেলেই সে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বোধ করতে পারবে। যুবতী নারীর দশা না জানলে তার হত্যার কথা কেউ সন্দেহ করবে না, হত্যাকারীকেও সন্ধান করবে না।

দেহটি গোর দেবার কথাটা ভেবে দেখে নদীতে ফেলাটাই সে সমীচীন মনে করে। তবে পন্থাটি মনঃপূত হলেও তা কম অপ্রীতিকর মনে হয় না। এ-সময়ে তার মাথায় খেয়াল আসে, সে-ব্যাপারে যুবক শিক্ষকের সাহায্য সে নেয় না কেন? খেয়াল হিসেবে যে-কথাটা তার মনে আসে, ভেবে দেখার পর তা তার ভালোই লাগে। দু-জন মানুষের পক্ষে কাজটি সম্পন্ন করতে দেরি হবে না, সাথী পেলে সেটি কাদেরের কাছে ততটা ন্যাক্কারজনকও মনে হবে না। তাছাড়া, কাদের এ-কথাও বুঝতে পারে যে, যে-লোকটি সব জেনেও কথাটি এ-পর্যন্ত প্রকাশ করে নাই, তাকে দেহ বহনের ব্যাপারে একবার জড়িত করতে পারলে চিরকালের জন্যে তার মুখ বন্ধ করা সহজ হবে। অবশ্য সে সাহায্য করতে রাজি হবে কিনা সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারে না, কিন্তু ভাবে, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী! তাছাড়া, যুবক শিক্ষকের চোখে নিজেকে দোষমুক্ত করার একটা ক্ষীণ আশাও মনে-মনে পোষণ করে। কে জানে একটি আজগুবি কথা বলে নিরীহ-সাদাসিধে লোকটির মনকে হয়তো অন্যপথে চালু করে দিতে সক্ষম হবে। সবদিক থেকে কথাটি তার পছন্দ হয়।

যুবক শিক্ষক বিনাতর্কে তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়। প্রথমে সামান্য ভয় পায়, তার প্রস্তাবটিও হয়তো পরিষ্কারভাবে বোঝে না, কিন্তু দ্বিরুক্তি না করে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। পরে কাজটির সামনাসামনি হলে সে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোনো প্রকারে দেহটি বহন করলেও নদীর পাড় দিয়ে নাবতে গিয়ে সে এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে আর ওঠে না। বাকি কাজটি কাদের একাকীই করে। পরে ধরাশায়ী যুবক শিক্ষকের দিকে তাকাতেই একটি ব্যাপারে সে নিঃসন্দেহ হয়। যুবক শিক্ষক মেরুদণ্ডশূন্য ব্যক্তি। প্রয়োজন হলেও তাকে বেশি ভয় দেখাতে হবে না, একটুকুতেই তাকে কাবু করা যাবে। পাড় বেয়ে উঠে কাদের নিশ্চিন্তচিত্তে বাড়ি ফিরে যায়।

দুর্ভাগ্যবশত পরে রাতের বেলায় কোম্পানির জাহাজের সারেঙ্গ যুবতী নারীর দেহটি নদীতে ভাসতে দেখে। তার পরিকল্পনাটি কার্যকরী হল না দেখে কাদের অতিশয় নিরাশ হয় কিন্তু সে আর কী করতে পারে? অবশ্য যুবক শিক্ষকের দিক থেকে কোনো বিপদ সে আশঙ্কা করে না, তাই তাকে কোনো কথা বলার প্রয়োজনও বোধ করে না। যে-মানুষ সত্যকথা জেনেও এবং মৃতদেহটি বহনকার্যে তাকে সাহায্য করেও কাউকে কিছু বলে নাই, এখন দেহটি খুঁজে পাওয়া গেছে শুনে সে হত্যাকাণ্ডের কথাটি প্রকাশ করবে তা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

তারপর যুবক শিক্ষক তাকে ডেকে পাঠায়। প্রথমে সে ঠিক করে যাবে না। ঘটনাটির বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বা ষড়যন্ত্রের কোনো প্রয়োজন দেখে না। না গেলে যুবক শিক্ষক এ-কথাও বুঝতে পারবে যে, ব্যাপারটি ভুলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু পরে কেমন অস্বস্তি এবং কৌতূহল হলে সে যুবক শিক্ষকের ঘরে হাজির হয়। যুবক শিক্ষকের ব্যবহার কিন্তু তার বোধগম্য হয় না। পরিষ্কার করে সে কিছু বলে না, যেটুকু বলে তাও অসংলগ্ন মনে হয়। কাদেরের সন্দেহ হয়, যুবক শিক্ষকের মনে যেন একটা কুমতলব। এ-সময়ে একটি কথা জানতে পেরে তার অনুশোচনার শেষ থাকে না। কথাটি এই যে, কাদের যে

BanglaBook.org

হত্যাকারী তা যুবক শিক্ষক নিশ্চিতভাবে জানত না। যেটুকু অনিশ্চয়তা ছিল তা কাদের নিজেই দূর করেছে।

কথাটি জানতে পেরে যুবক শিক্ষকও কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে, তার ব্যবহারও আরো বিচিত্র হয়ে ওঠে। সে যেন একটা বিভ্রমের ঘোরে ছিল, সে-ঘোরটা কেটেছে। কিন্তু তবু তার ব্যবহার বোধগম্য না হয়ে আরো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। কাদের একটি উপসংহারেই উপনীত হতে সক্ষম হয়। সত্যকথা জানতে পেরে যুবক শিক্ষক একটি বিকৃত আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় বার সে নিজেই যুবক শিক্ষকের কাছে হাজির হয়। মনে অশান্তি। তাছাড়া, সেদিন সকালে দাদাসাহেব যুবক শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সে-কথা সে জানে।

যুবক শিক্ষককে এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে হয়। তাছাড়া মনে হয়, তার যেন কী একটা কথা বলার আছে। তার আচরণ-ব্যবহারে কোনোপ্রকার বিরুদ্ধতা প্রকাশ পায় না বলে কাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। সে কোনো কথা বলতে আসে নাই, জানতেই এসেছে।

অবশেষে যুবক শিক্ষক তার মনের কথাটি কোনোপ্রকারে প্রকাশ করে। বলতে গিয়ে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, শব্দগুলিও ঠিকভাবে সরে না। যা বলে তা-ও অতিশয় বিচিত্র শোনায়। তার মর্মার্থ এই যে, যুবতী নারীর প্রতি প্রণয়ের কথাটা কাদের বলে নাই। সে-কথাটি বিশেষ জরুরি এই কারণে যে অপরাধটি ক্ষমার্হ কি ক্ষমার্হ নয় তা তার উত্তরের ওপরই নির্ভর করে। যুবক শিক্ষকের বক্তব্যটি এতই অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় যে কাদের স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এ কী ধরনের কথা? কাদের কি একটি বদ্ধপাগল মানুষের হাতে পড়েছে? বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি ভয়ানক গুরুতর কিন্তু কী করে লোকটি প্রেমের কথা ভাবতে পারছে? তাছাড়া, নারী-পুরুষের সম্পর্কের কারণ কি শুধুমাত্র প্রেম? না, লোকটি নিঃসন্দেহে উন্মাদ। তা না হলে এমন অহেতুক কথার উত্থাপন করবে কেন? কাদের হঠাৎ রাগে অন্ধ হয়ে পড়ে। সে-ক্রোধ সামলানো তার পক্ষে সহজ হয় না। তারপর যুবক শিক্ষকও অকারণে বেসামাল হয়ে পড়ে। তার মধ্যে যেন একটা বিষম মানসিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। অবশেষে সে পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করে যে, তার পক্ষে কাদেরকে ক্ষমা করা আর সম্ভব নয়।

লোকটি যে উন্মাদ সে-বিষয়ে কাদেরের এবার আর কোনো সন্দেহ থাকে না। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে সে এবার সত্যিই ভয় পায়। ফলে, যুবক শিক্ষককে ভয় দেখানো অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করে। যুবক শিক্ষক একটু সুস্থির হলে সে তাকে পরিষ্কারভাবে বলে যে, কথাটা প্রকাশ করলে তার সর্বনাশই হবে। কিন্তু ভয়-প্রদর্শন বৃথা মনে হয়। কাদেরের কথা যুবক শিক্ষকের কানে পৌঁছায় না। কাদের যে প্রেমিক নয়, সে-দুঃখেই সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। লোকটির প্রতি ক্রোধে-ঘৃণায় কাদেরের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়।

সচকিত হয়ে যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, কাদেরের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎটি সে কাদেরের দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নাই। অবশেষে সব দুর্বলতা-স্বপ্ন-কল্পনা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, কাদেরের কুকীর্তিটি স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখবার পথে আর বাধা নাই। কাদের যখন তাকে কোনোপ্রকারে আর প্রভাবিত করতে পারবে না তখন তার দৃষ্টিতে ব্যাপারটি দেখতে কোনো ভয় নাই। এখন সে তার যুক্তি-অজুহাত সম্পূর্ণভাবে বুঝতে চায়।

কাদেরের যুক্তির উপসংহার কী? শুধু এই যে, যুবক শিক্ষক একটি মতিচ্ছন্ন মানুষ। সেখানেই তার যুক্তির শেষ। অপরের বিষয়ে এ-সিদ্ধান্তের পর নিজের সম্পর্কে কী তার বলার আছে? কিছু না। সেখানে তার যুক্তি শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করে।

না, কাদের যে প্রেমিক নয় সে-কথাই তার দুঃখের কারণ নয়। আসল কারণ এই যে, একটি যুবতী নারী নিতান্ত অর্থহীনভাবেই প্রাণ হারিয়েছে। তার মৃত্যুতে কাদেরের মনে একটু দুঃখ-বেদনা জাগে নাই। শূন্য হৃদয়ে দুঃখ-বেদনা জাগে না। কাদেরের হৃদয়ের শূন্যতার জন্যেই যুবতী নারীর মৃত্যুটা একটি নির্মম হত্যা ছাড়া কিছু নয়।

BanglaBook.org

হয়তো যুবক শিক্ষক মতিচ্ছন্ন মানুষ। সে-বিষয়ে নিজে সে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু তার কর্তব্য সে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। কাদেরের বিচারের যে-ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল সে-ভার সে আর বহন করতে পারবে না। তাকে এবার কথাটা প্রকাশ করতে হবে। প্রথমে দাদাসাহেবকে, তারপর কর্তৃপক্ষকে।

কর্তব্যটি পালন করা যে কষ্টসাধ্য হবে তা সে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। সর্বপ্রথম দাদাসাহেবের কথাই তার মনে আসে। কথাটা তাঁকে বলা সহজ হবে না। তিনি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন আঘাত পাবেন, যে-আঘাত বৃদ্ধবয়সে তাঁর পক্ষে সামলে ওঠা হয়তো দুষ্কর হবে। হয়তো হঠাৎ তিনি দেখতে পাবেন, যে আশা-ভরসা আশ্বাস-বিশ্বাসের জোরে এতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, তা সারশূন্য হয়ে উঠেছে : সমস্ত জীবনটাই এক পলকের মধ্যে নিষ্ফল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, যুবক শিক্ষক জানে তিনি অতিশয় দয়াবান মানুষ। তাঁর দয়াবান চরিত্রের ভিত্তি হল মানুষের প্রতি অটল বিশ্বাস! এমন মানুষের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আঘাত দেওয়া কি সহজ? কর্তৃপক্ষকে বলাও সহজ হবে না। যে-হত্যাকাণ্ড সে নিজের চোখে দেখে নাই সে-হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে কী সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করবে সে? বলতে বিলম্বেরও কী কারণ দেবে? তার মনের নানাপ্রকার বিচিত্র বিশ্বাস-চিন্তাধারার কথা তাদেরকে বলতে হবে। কিন্তু তখন তাদের কাছে তার অভিযোগটি বিভ্রান্তমস্তিষ্কের প্রলাপ বলে মনে হবে না কি? তাছাড়া, নদীতে যুবতী নারীর দেহটি ফেলার ব্যাপারে তার সহায়তারও কী ব্যাখ্যা দেবে?

কথাটি প্রকাশ করলে তার সমূহ ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে। কাদের ইতিমধ্যে তার পরিণামের কথা বলে তাকে ভয়-প্রদর্শন করেছে। যুবক শিক্ষক শুধু যে তার অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না তা নয়, কাদের তার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনলে নিজেকে রক্ষা করার কোনো উপায় তার থাকবে না। এখন সে ভাবছে দাদাসাহেব কথাটি জেনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন। হয়তো তিনি তা বিশ্বাস করতেই চাইবেন না। অকারণে তার কনিষ্ঠভ্রাতার গুরুতর ক্ষতি সে করতে চাইছে এই ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে কাদেরকে রক্ষা তো করবেনই, তার বিরুদ্ধে কাদেরের পাল্টা জবাবটি যাতে টেকে তার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। সত্য কথা জেনেই যে তিনি এমন অন্যায় কাজ করবেন তা নয় : কাদেরকে অপরাধী বলে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আরেকটি কথা। ভাইকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছাড়া আরেকটি প্রয়োজনও তিনি বোধ করবেন : তাঁর পরিবারের সুনাম রক্ষা করা।

যুবক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ না আনলেও কথাটি প্রকাশ করার পর তাকে বড়বাড়ির আশ্রয় এবং ইস্কুলের শিক্ষকতার চাকুরিটি ছাড়াতে হবে, তারপর এখানে থাকতে তার বিবেকে বাধবে। তখন সে কোথায় যাবে? কোথায়ই-বা এমন লাভজনক চাকুরি বা দাদাসাহেবের মতো এমন স্নেহ-দয়াশীল অভিভাবক পাবে?

তবু কথাটা প্রকাশ না করে তার উপায় নাই। উপায় থাকলে সে বলত না। বাঁশঝাড়ে একটি নারী অর্থহীনভাবে জীবন দিয়েছে। তার বিশ্বাস, মানুষের জীবন এত মূল্যহীন নয়। না, সত্যিই তার উপায় নাই।

যুবক শিক্ষকের শীর্ণ মুখ শুষ্ক কাঠের মতো নীরস-কঠিন মনে হয়। সে-মুখ কখনো যেন হাসবে না কাঁদবে না।

তেরো

দীর্ঘ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নানারকম মৃদু সঙ্কুচিত আওয়াজ শুরু হয়েছে : দিনাগমনের বেশি দেরি নাই।

শীতটা কনকনে মনে হয়। তার হাড়ে-মজ্জাতে সে-শীত হানা দিলেও যুবক শিক্ষক নিশ্চল হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করে। চৌকির নিকটে টিনের বাক্সটি তৈরি, টেবিলের ওপরটা শূন্য, ঘরের কোণ থেকে দড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

banglabook.org

তারপর আকাশের ধূসর আলো কিছু পরিস্ফুট হয়ে উঠলে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এবার যুবক শিক্ষক উঠে পড়ে দরজার নিচে দুইধাপ সিঁড়ির ওপর বসে ওজু করে। একবার সে দাদাসাহেবের জানালার দিকে তাকায়। তাঁর ঘরে আলো। মুহূর্তের মধ্যে যুবক শিক্ষকের ভেতরটা ব্যথায় মুচড়িয়ে ওঠে। দাদাসাহেব আজ নির্মম কথাটি জানতে পারবেন।

ঘরের কোণে এখনো অন্ধকার। সে-অন্ধকারে নক্‌শা-কাটা শীতলপাটির জায়নামাজ বিছিয়ে দাঁড়াতেই সে ভেজানো দরজার কাছে একটি আওয়াজ শোনে। মাথাটা ঈষৎ সরিয়ে দেখে, সেখানে কাদের দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাকে দেখেও সে যেন দেখে না। কোনো কথা না বলে তার দিকে পিঠ দিয়ে সে নামাজ পড়তে শুরু করে। কাদেরের অস্তিত্বের আর কোনো মূল্য নাই যেন। যুবক শিক্ষক তার মনে যে অত্যন্ত গুরুতর একটি কর্তব্যবোধের ভার বোধ করে, তার তলে কাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বড়বাড়িতে আসার পূর্বে নিয়মিতভাবে নামাজ পড়ার অভ্যাস যুবক শিক্ষকের ছিল না। আজকাল অন্ততপক্ষে সকাল-সন্ধ্যায় নামাজটা পড়ে। তবু ঠিক মনঃপ্রাণ দিয়ে পড়ে যে তা নয়। তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করলেও তা সে সম্পূর্ণভাবে বোঝে না। কিন্তু আজ সে হঠাৎ অত্যন্ত নিঃসঙ্গ এবং অসহায় বোধ করে বলে নামাজ পড়তে দাঁড়ালেই তার মন একটি তীব্র ভাবোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। সে যেন আর তোতার মতো মুখস্থ-করা বুলি আবৃত্তি করে সারশূন্য কর্তব্যপালন করছে না : যাঁর সামনে সে দাঁড়িয়েছে তাঁর উপস্থিতি সে অন্তর দিয়ে অনুভব করছে, তার বক্তব্য তাঁর কর্ণগোচর হচ্ছে তাতেও তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

মনে যে-অপরিচিত ভাবোচ্ছ্বাসের উদয় হয়, তাতে কিছু আশান্বিত হয়ে সে নিঃশব্দে সূরা আল্-খালাক পড়ে। অসংখ্যবার পড়েও যে-সূরাটি তার মনে কখনো আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই, আজ সে-সূরার প্রতিটি শব্দ সহস্র অর্থে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। তাতে আশ্রয়-রক্ষার জন্যে নিঃসহায়ের যে-আকুল আবেদন, সে-আবেদনের মর্মার্থও সহসা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তার সাহায্যের দরকার। সঙ্কটের সময় কেবল দাদাসাহেবের কাছেই সে যেতে পারত। আজ সে-দরজা বন্ধ।

কিন্তু যুবক শিক্ষক শীঘ্র এ-কথা উপলব্ধি করে যে, ভাবাপ্লুত হয়ে সজ্ঞানে প্রার্থনা করেও সে মনে কোনো শান্তি পাচ্ছে না। শীঘ্র তার মনে হয়, হয়তো কাদেরের উপস্থিতিই তার অশান্তির কারণ। কেন সে আবার এসেছে? কী তার বলার বাকি? যুবক শিক্ষকের সামনে কঠিন কর্তব্য। সে-কর্তব্যপালনের জন্যে তার শান্তি ও সাহসের প্রয়োজন। কাদের কেন তাকে বিরক্ত করতে এসেছে? যুবক শিক্ষকের মতো সে-ও যদি আজ নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ বোধ করে, তার জন্যে তার নির্দয় অন্তরই দায়ী। সে-অন্তর মরুপ্রান্তরের মতোই ধু-ধু করে। সেখানে কোনো উদ্ভিদের জন্ম হলেও সে-উদ্ভিদ শীঘ্র কণ্টকাকীর্ণ হয়। সেখানে যদি ক্ষীণ আর্তনাদ জাগে, সে-আর্তনাদ চতুর্দিকের বালুরাশি অতিক্রম করতে পারে না। না, কাদেরের কোনো আবেদন থাকলেও তার কানে তা পৌঁছুবে না।

অশান্তি কাটে না দেখে যুবক শিক্ষক আরেকটি সূরা পছন্দ করে। কেন সেটি পছন্দ করে তা বোঝে না, কিন্তু তৃষ্ণার্তের মতো অধীরভাবে নিঃশব্দে তা আওড়াতে থাকে। দ্রুতভাবে তার ঠোঁট নড়ে, মনের গহ্বর থেকে সূরাটির শব্দগুলি অনর্গল ধারায় কিন্তু অশ্রোতব্যভাবে ঝরতে থাকে, তার চোখে চঞ্চলতা আসে। আবু লাহাবের শক্তি ধ্বংস হবে, সে ধ্বংস হবে : তার ধনসম্পত্তি তাকে রক্ষা করতে পারবে না। লেলিহান আগুনে সে নিক্ষিপ্ত হবে, তার স্ত্রী—কাষ্ঠবাহক স্ত্রী—তার গলায় তালতন্তু তৈরি ফাঁস-দড়ি পড়বে। সূরাটি পড়তে পড়তে তার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে, কিন্তু আবৃত্তিতে একটু স্খলন হয় না, মনে কোনো ভয়ও জাগে না। কেন সে সূরাটি পড়ছে? তার চোখে কাদের কি আবু লাহাব-দম্পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে? তাদের পাপ কি তার পাপের সমতুল্য? তাদের যে-শাস্তিবিধান কেতাবে লিখিত,

সে-শাস্তিবিধানই কি যুবক শিক্ষক তার জন্যে কামনা করে? অথবা পাপীর শাস্তি যে অনিবার্য সে-বিষয়ে তার মনকে সে কি নিশ্চিত করতে চায় যাতে তার সম্মুখে যে-কঠোর কর্তব্য সে-কর্তব্যপালনে তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা দেখা না দেয়?

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে না। মনে সে শান্তিও পায় না। নিমীলিত চোখে ভক্তিমান শান্তচিত্ত ব্যক্তির মতো সে নামাজ পড়ে, কিন্তু সেটি বাহ্যিক রূপ । ভেতরে অশান্তির জ্বালা।

অবশেষে নামাজ শেষ করে মাটিতে বসেই কাদেরের দিকে মুখটা সামান্য ফেরায়, কিছু বলে না। কাদের এবার তার খনখনে গলায় প্রশ্ন করে, "কী ব্যাপার?"

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, কাদের তার প্রস্থানোদ্যোগ লক্ষ করে। তার কারণ জানতে চায়।

সামনের দেয়ালটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক নীরব হয়ে থকে। তার উত্তরের কোনো প্রয়োজন নাই। কাদের কিছু না বলে কতক্ষণ চুপ করে থাকে। মনে হয় সে আর কিছু বলবে না, কিছু ঘটবেও না। তারপর অকস্মাৎ বিষম ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে অস্ফুটকণ্ঠে বিড়বিড় করতে শুরু করে। যুবক শিক্ষক তার কথা বুঝতে পারে না, বুঝবার চেষ্টাও করে না। কেবল তার ক্রোধটা দমকা হাওয়ার মতো তার গায়ে ঝাপটা দিলে সে অকারণে দুর্বল বোধ করতে শুরু করে।

তারপর কাদের নীরব হয়ে কেমন দম খিচে থাকে যেন। অবশেষে কৃত্রিম সংযত গলায় প্রশ্ন করে, "ক-জন চাই? সাক্ষী। ক-জন চাই?"

সামনের দেয়ালের রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে। সে-রক্তিমাভার অর্থ যুবক শিক্ষক যেমন বোঝে না, তেমনি কাদেরের কথারও অর্থ সে বোঝে না। নিস্পন্দভাবে সে বসে থাকে : সে যেন স্তূপাকার হাড়মাত্র।

কাদেরের সংযম স্থায়ী হয় না। সে এবার গর্জে ওঠে, "ক-জন সাক্ষী চাই? তারা বলবে কোথায় আপনাকে দেখেছে।"

এবার যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, কাদের তাকে ভয়-প্রদর্শন করছে। কিন্তু এবারও কিছু না বলে সে পূর্ববৎ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। তবে আরেকটি কথা বুঝতে পেরে সে স্বস্তিই বোধ করে। সে মুখ খুলে কথাটি যদিও বলে নাই, কাদের তার সঙ্কল্পটি অনুমান করতে পেরেছে। তাকে মুখ খুলে কথাটি বলতে হবে না।

যুবক শিক্ষকের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর না পেলে কাদের হয়তো হতাশ হয়েই এবার নীরব হয়ে পড়ে। মনে হয়, দমকা হাওয়া নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘরময় নীরবতাটি অবিচ্ছিন্ন থাকলে এক সময়ে যুবক শিক্ষকের মনে হয়, হয়তো কাদের কখন নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে। তাকিয়ে দেখবে কি দেখবে না সে-কথা ভাবছে, এমন সময় নির্ভ্রান্ত অপরিচিত গলায় আস্তে প্রশ্ন করে, "মেয়েলোকটাকে চিনতেন?"

কাদেরের কণ্ঠস্বর তাকে এতই বিস্মিত করে যে তার মুখ হতে আপনা থেকেই একটা উত্তর বেরিয়ে আসে। সে বলে, "না।"

"সে বেঁচে নাই বা কীভাবে মরেছে, তাতে আপনার কী?

প্রশ্নটির জন্যেই হোক বা তার কণ্ঠস্বরের জন্যেই হোক যুবক শিক্ষকের মনে এবার একটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কাদের তার জন্যে কোনো প্রকারের ফাঁক তৈরি করছে যেন। থেমে কাদের আবার বলে, "কিন্তু দুর্ঘটনাটির কথা কাউকে বললে আমার কী হবে জানেন?" সে যেন অবোধ শিশুর সঙ্গে কথা বলছে। যুবক শিক্ষক আরো সতর্ক হয়, কিন্তু উত্তরটা শুনবার জন্যে তার শ্রবণেন্দ্রিয়ও সজাগ হয়ে ওঠে। পূর্ববৎ কণ্ঠে কাদের বলে, "ফাঁসি।" থেমে আবার বলে, "তাতে আপনার লাভ কী হবে?"

প্রথমে কোনো প্রতিক্রিয়াই যুবক শিক্ষক অনুভব করে না। তারপর সে বুঝতে পারে,

BanglaBook.org

হঠাৎ তার সমস্ত শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমন ক্ষিপ্রগতিতে সে-দুর্বলতা সমস্ত শরীরে বিস্তারলাভ করে যে সে তা প্রতিরোধ করার কোনোই চেষ্টা করে না। কিন্তু কাদের যে-শব্দটি উচ্চারণ করেছে সে-শব্দটিতে সে এমন তীব্রভাবে আঘাত পাবে কেন? কথাটা কি সে একবারও ভাবে নাই? না, কথাটা সে ভাবে নাই। অন্ততপক্ষে, স্পষ্টভাবে ভাবে নাই। সে তার কর্তব্যের কথা ভেবেছে, কিন্তু পরিণামের কথা স্পষ্টভাবে ভাবে নাই। সে কি মনে করেছিল কথাটি তার এলাকার বাইরে? না, কথাটি ভাবতে তার সাহস হয় নাই?

যুবক শিক্ষক তার মুখের পার্শ্বদেশে কাদেরের দৃষ্টি অনুভব করে। একটা উত্তরের আশায় কাদের তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটা উত্তর দেয়ার প্রয়োজনও সে নিজেই বোধ করে কিন্তু কী করে উত্তর দেবে? তার মনে হয়, কাদেরের দৃষ্টির তলে সে যেন গলে যাচ্ছে। একটি কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ ক্রমশ একটি দায়িত্বহীন মানুষে, একটি বুদ্ধিমান মানুষ নির্বোধ মানুষে পরিণত হচ্ছে। যা সে শক্ত করে ধরেছিল তা যেন হাত থেকে ফস্‌কে যাচ্ছে। না, তার প্রতি ভাগ্যের নির্মমতা সত্যিই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ে একটি মৃতদেহ দেখেই তার নিস্তার নাই, একটি মানুষের জীবনমৃত্যুর দায়িত্বও তাকে নিতে হবে।

যুবক শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেলেও হয়তো তার মুখে বিহ্বলতার ভাব লক্ষ করে কাদের আশ্বস্ত বোধ করে। এবার বড়বাড়ির ছোকরাটি সকালের নাস্তা-পানি নিয়ে এলে কোনো কথা বলে, যেন আলাপ-আলোচনার মধ্যখানে বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে কাদের হঠাৎ উঠে চলে যায়। যুবক শিক্ষক যখন সে-কথা বুঝতে পারে তখন সে অতি বিস্মিত হয়ে দরজার দিকে তাকায়। দরজাটি অর্থহীনভাবে শূন্য মনে হয়।

কথা শেষ না করে এমনভাবে কাদের চলে গেল কেন? সে কি তাহলে বুঝতে পারে নাই যে আজই সকালে তার নিষ্ঠুর কীর্তির কথা প্রকাশ করবে বলে সে মনস্থির করেছে? কথাটা অবশ্য বিশ্বাস হয় না। তবে যুবক শিক্ষককে নীরব থাকবার জন্যে স্পষ্টভাবে অনুরোধ করে সে তার বক্তব্যটি সম্পূর্ণ করে নাই কেন?

অবশেষে একটি কথা যুবক শিক্ষকের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং তা তার কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ মনে হয়। কাদের তাকে ভয় দেখিয়েছে, পরিণামের কথা বলেছে, কিন্তু বাঁশঝাড়ের কথাটি প্রকাশ না করার জন্যে একবারও অনুরোধ করে নাই। কেন? কারণ এ-কথা সে জানে যে, যুবক শিক্ষক একবার তার কাজের পরিণাম বুঝতে পারলে কথাটি প্রকাশ করা উচিত হবে কি হবে না তা সে নিজেই বুঝতে পারবে, নিষেধের প্রয়োজন হবে না। কাদের কি তার বুদ্ধিবিবেচনায় গভীর আস্থা প্রকাশ করে নাই?

জায়নামাজে বসেই যুবক শিক্ষক স্থির হয়ে থাকে। সময় কাটে। টেবিলের ওপর চা কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে থেমে গেছে, বাইরে উঠানে রোদ পড়েছে।

যুবক শিক্ষকের সন্দেহ থাকে না, কোথায় কী যেন গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে, সে যেন নিজের উদ্দেশ্যই ভালোভাবে বুঝতে পারছে না। সে কী চায়? কেনই-বা তার মধ্যে একটুতেই এমন বিহ্বলতা দেখা দেয়? অথচ মাঝে মাঝে রাগান্বিত হলেও কাদেরকে এমন সুস্থির এবং আত্মনির্ভরশীল মনে হয় কেন? সে যেন সব জানে, সব বোঝে।

তাছাড়া, একটি নারীর মৃত্যুর অর্থই-বা কী?

অবশেষে যুবক শিক্ষক উঠে দাঁড়ায়। দেহের অসীম দুর্বলতা তার মনেও গভীর অবসাদ সৃষ্টি করেছে। সে যন্ত্রচালিতের মতো বড়বাড়ির অভিমুখে রওনা হয়। সে জানে, অন্যান্য দিনের মতো সে ছেলেমেয়েদের পড়াতেই যাচ্ছে।

না, তার সঙ্কল্পে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তবে আজ সকালে সে দাদাসাহেবকে কথাটা না বলে সন্ধ্যাবেলায়ই বলবে। ইতিমধ্যে এত দেরি হয়েছে, আরেকটু দেরি হলে তেমন ক্ষতি কী? বিষয়টি আবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। তার বিবেচনায় যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে একবার বলে ফেললে পরে শোধরানো সহজ হবে না। অবশ্য ভুলভ্রান্তির কোনো সুযোগ

BanglaBook.org

সে দেখতে পায় না। তবু বিষয়টি অতি গুরুতর। তার সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া ভালো।

একটি কথায় সে নিজেই কিছু বিস্মিত না হয়ে পারে না। বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি প্রকাশ করায় কিছু বিলম্বের সুযোগ পেয়ে সে এমন স্বস্তিবোধ করছে কেন?

চৌদ্দ

দুপুরবেলায় ইস্কুলের বিশ্রামঘরে আত্মপ্রবঞ্চনার কথাটি যুবক শিক্ষক সর্বপ্রথম আপন-মনে স্বীকার করে। বস্তুত, স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়। সর্বপ্রকার চেষ্টার শেষ হয়েছে, কি করে তার ক'দিনব্যাপী মানসিক বিহ্বলতার সত্য কারণ নিজের কাছে আর ঢেকে রাখে? সঙ্গে সঙ্গে যে-ন্যায়বানের শ্বেতসৌধ সে সৃষ্টি করেছিল তা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়। নিজের কাছেই সে নিজে ধরা পড়েছে অবশেষে : কোথাও আর একটি প্রাচীর দাঁড়িয়ে নাই যার পশ্চাতে সে আত্মগোপন করতে পারে।

সত্যি, সন্দেহের আর অবকাশ নাই। জটিল এবং পরিশ্রমসিদ্ধ আত্মপ্রবঞ্চনাটি শুরু হয় তখন যখন আত্মরক্ষার প্রবল বাসনার জন্য তার বিবেকের নির্দেশ শুনতে সে অক্ষম হয়। তারপর তার লজ্জাকর ভীতি-দুর্বলতা সে নিজের কাছেই লুকাবার চেষ্টা করে।

কাদের একটি গুরুতর অপরাধ করেছে তা জানতে পারলে একটি কঠিন সমস্যাও সে অনতিবিলম্বে দেখতে পায়। লোকটি সম্ভ্রান্তশালী অভিভাবক-আশ্রয়দাতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অন্যদিকে, যুবতী নারী শুধু যে তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা তা নয়, সে আর জীবিতদের মধ্যে কখনো প্রত্যাবর্তন করবে না। আজ সকালে কাদেরের উক্তির পরেই সে তা বুঝতে পারে। কাদের তাকে প্রশ্ন করেছিল, সে যুবতী নারীকে চিনত কিনা। হত্যাকাণ্ডটি প্রকাশ করলে তার কী শাস্তি হবে তা-ও সে স্পষ্টভাবে বলেছিল। বস্তুত, আত্মপ্রবঞ্চনার কথাটি বুঝবার ব্যাপারে কাদেরই তাকে সাহায্য করেছে।

যুবক শিক্ষক লজ্জাই বোধ করে, তার কানে কেমন ঝাঁঝ ধরে। কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নাই, সে-ভাবেই মানসিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। বিবেক বলে, কথাটি প্রকাশ করা তার কর্তব্য, কিন্তু কাজটি তার কাছে দুষ্কর মনে হয়। সে দুর্বল মানুষ। মানসিক দ্বন্দ্বটি অসহ্য হয়ে উঠলে সে একটি পলায়নপথ আবিষ্কার করে : স্বপ্নরাজ্যে সে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার দুর্বলতার সমর্থনে যদি কোনো যুক্তি থাকে তবে তা হয়তো এই যে, যুবতী নারী তার অপরিচিতা বলেই তার প্রতি নির্মম অবিচারটি সে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে নাই, কাদেরের অপরাধটিও হৃদয় দিয়ে অনুভব করে নাই। কিন্তু সে-যুক্তিতে জোর আছে কি নাই তার বিবেচনা এখন তার কাছে অহেতুক মনে হয়।

কর্তব্যটি যাতে পালন না করতে হয় সে-জন্যে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করে সেখানেই সে এ-ক'দিন বাস করছে। যুবতী নারীর মৃতদেহটি বহনের ব্যাপারে কাদের যখন তার সাহায্যপ্রার্থী হয় তখন সে ইতিমধ্যে স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছেছে। বাস্তবজগৎ তখন মূল্যহীন বলে কাদেরকে সে-ব্যাপারে সাহায্য করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। তবে স্বপ্নরাজ্যে সে নিরাপদ বোধ করে নাই : সব প্রবঞ্চনার মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনাই অধিকতম শক্ত। তাই সেখানে সে অলস হয়ে বসে থাকে নাই। তার বাহ্যিক আচরণ বিহ্বল মানুষের মতো হলেও সে অতি দক্ষতা এবং ব্যগ্রতার সঙ্গে কাদেরকে দোষমুক্ত করবার জন্যে একটির পর একটি বিচিত্র অবিশ্বাস্য যুক্তি-অজুহাত আবিষ্কার করেছে। কেন? কারণ কাদের নির্দোষ প্রমাণিত হলেই তার রক্ষা। তাহলে বিবেকের নির্দেশটি তাকে আর শুনতে হবে না, বিপজ্জনক কর্তব্যটিও পালন করতে হবে না। আত্মরক্ষার জন্যে সে কী সব যুক্তি-অজুহাতই না আবিষ্কার করেছে এবং তাতে নিজেই বিশ্বাস করেছে? যেমন, কাদের কেন মৃতদেহটি নদীতে ফেলবে ঠিক করে।

BanglaBook.org

হঠাৎ যুবক শিক্ষকের কাছে কাদের একটি দয়াশীল মহৎ মানুষ হিসেবে উদয় হয় এবং সে যুবতী নারীকে একটি নিদারুণ অপমান থেকে উদ্ধার করতে চায়।

তবে গোড়াতে আত্মপ্রবঞ্চনা শক্ত বলেই নয়, অন্য একটি কারণেও সে-সব যুক্তির পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করা তার পক্ষে তত সহজ হয় নাই : তখন বাঁশঝাড়ের সত্য কথাটি সে নিশ্চিতভাবে জানত না। দুঃখের বিষয়, কাদের নিজের মুখেই কথাটি স্বীকার করে বসে। তারপর যুবক শিক্ষকের পক্ষে স্বপ্নরাজ্যে বাস করা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে, পালাবারও কোনো পথ থাকে না। কিন্তু হাল ছাড়তে সে রাজি হয় না। তার ভীত-নিপীড়িত মস্তিষ্ক শীঘ্র একটি নূতন যুক্তি দেখতে পায়। যুক্তিটি এই যে, যুবতী নারীর প্রতি প্রেম ছিল বলেই কাদের তার অন্তিম ব্যবস্থা না করে পারে নাই। এবং, যেহেতু নারীর প্রতি কাদেরের প্রেম ছিল সেহেতু হত্যাকাণ্ডটি শুধুমাত্র একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা নয় কি? আর সে যুক্তি অনুসারে তার অপরাধও কি ক্ষমার্হ নয়?

কাদেরের হাতেই যুবক শিক্ষকের স্বপ্নরাজ্যের দুর্বল প্রাচীর দ্বিতীয় বার ভাঙে। প্রেমের কথাটি সে স্বীকার করে না। বরঞ্চ সেটি যে অচিন্তনীয় সে-কথা সে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়। এবার যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, তার পালাবার সত্যিই কোনো পথ নাই : তার কর্তব্যটি যতই ভীতিজনক হোক না কেন, সেটি এড়াবার আর কোনো উপায় নাই।

সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে সে যখন ঘটনাটি প্রকাশ করবার জন্যে সাহস যোগাড় করার চেষ্টা করছে তখন কাদের তাকে প্রথম বার একটু সাহায্য করে, স্বপ্নরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করার একটি পথ দেখায় তাকে। সে বলে, ঘটনাটি প্রকাশ করলে তার চূড়ান্ত শাস্তি হবে এবং তার জন্যে যুবক শিক্ষক একাই দায়ী হবে। কাদের যে-বীভৎস শব্দটির উচ্চারণ করে সে-শব্দটিই ঘোর তমসার মধ্যে একটু আলোর সৃষ্টি করে। নতুন উদ্যমে যুবক শিক্ষক তার যুক্তির তলোয়ারে শান দেয় এবং তার এই বিশ্বাস হয় যে, সে-অস্ত্রটির সাহায্যে সে যে শুধু বিবেকের সামনাসামনি হতে পারবে তা নয়, বিবেককে কাবু পর্যন্ত করতে পারবে। এবার তার নিজের সর্বনাশের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে অন্য একটি মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে। সে নিজের প্রাণের জন্যে ভীত নয়, অন্য মানুষের প্রাণের জন্যে ভীত। সে-মানুষের জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে একটি ভীষণ দায়িত্ব গ্রহণ করার যথার্থ সব কারণ কি তার জানা আছে?

যুক্তিটি অব্যর্থ মনে হয় কেবল অল্প সময়ের জন্যেই। শীঘ্র সে বুঝতে পারে, সেটি অতিশয় দুর্বল। আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যে যথেষ্ট তো নয়ই, তা দিয়ে বিবেককেও মানানো যায় না। আর কোনো উপায় যখন নাই তখন সত্য কথাটি স্বীকার করতে অসীম লজ্জা হলেও তা স্বীকার করাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? তাছাড়া, আপন-মনে বিবেকের মূল্য কী?

সত্য কথা হল এই, বাঁশঝাড়ের হত্যাকাণ্ডটি প্রকাশ করার সাহস তার নাই। প্রথম দিন ছিল না, আজও নাই। সে ভীত, দুর্বলচিত্ত অসহায় মানুষ। কাদেরের ভয়-প্রদর্শন কার্যকরী হয়েছে। নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর যখন সম্ভব নয় তখন ফাঁকি দেবার চেষ্টা ছেড়ে কেন সে ভীত সে-কথা খোলাখুলিভাবে বুঝবার চেষ্টা করাটাই কি সাধু কাজ হবে না? তাছাড়া, বিবেকের মুখ বন্ধ করবার জন্যে ছলনার চেয়ে এ-পন্থাটাই অধিকতর কার্যকরী। বস্তুত তার মনে হয়, ভীতির নগ্ন চেহারা দেখে বিবেকের কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়েছে।

ঘটনাটি প্রকাশ না করার পক্ষে যে-সব যুক্তি সে পরিষ্কারভাবে ভাবতে সাহস পায় নাই, এবার সে-সব যুক্তি বিশ্লেষণ করে দেখতে তার আর বাধে না। চারপাশে খোলা মাঠ, আর বাধা কোথায়? প্রথমত, সে নিজের কথাই ভাবে। কে সে? একজন দরিদ্র শিক্ষক মাত্র। বর্তমানে জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনী কিন্তু দয়াশীল মানুষের অভিভাবকত্বে জীবনে সর্বপ্রথম বেদনাদায়ক অভাব-অভিযোগটা যেন ভুলেছে, সুখের একটু আস্বাদ পেতে শুরু করেছে। তার ব্যক্তিগত দারিদ্র্যই যে শুধু ঘুচেছে তা নয়। সে তার বিধবা মা এবং তার মুখাপেক্ষী দুটি ভাই-বোনকেও খাওয়াতে-পরাতে পারছে। তার যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে কে তাদের

দেখাশোনা করবে? কাদের যে তাকে মিছামিছি ভয় দেখিয়েছে সে-কথা ভাবা অন্যায়।

তাছাড়া, কার জন্যেই-বা সে নিজের সর্বনাশ করবে? যুবতী নারী তার আত্মীয়-বন্ধু নয়, তার মৃত্যুতে সে ব্যক্তিগতভাবে কোনোপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এ-হতভাগা দেশে কত যুবতী নারীর জীবন অর্থহীনভাবে এবং অকারণে শেষ হয়, কে প্রতিবাদ করে, কে একবার ফিরে তাকায়? যেখানে জীবন মূল্যহীন সেখানে আরেকটি জীবন শেষ হয়েছে। কীভাবে হয়েছে, তাতে কোনো অন্যায়-অবিচার হয়েছে কিনা, সে-বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে সে নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনবে কেন?

তারপর, কাদেরের কথা। হোক তার অপরাধ অতি গুরুতর বা যুবতী নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণ পশুবৎ বাসনা, হোক সে নির্মম-নির্দয় মানুষ, তবু সে যুবক শিক্ষকের কোনো ক্ষতি করে নাই। তাছাড়া, কাদের তার বন্ধু না হোক, সে তার শত্রুও নয় : তার প্রতি সে হিংসাদ্বেষ বা প্রতিহিংসার ভাব বোধ করে না। কাদেরের সঙ্গে লড়াই করে তার কী লাভ হবে, কারই-বা সে মঙ্গল করবে?

যুবক শিক্ষকের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, যুবতী নারীর মৃত্যুর সুবিচার হোক, তার চেষ্টা করলে কেউ তাকে সমর্থন করবে না, কেউ তাকে সাধু-সত্যবান বলে তার গলায় মালা দেবে না। সত্যবাদিতার মূল্য অবশ্য কেউ খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করে না। এ-কথাও কেউ অস্বীকার করে না যে, সাক্ষ্য দেবার সমন পড়লে মিথ্যা বলা অন্যায়—বিশেষ করে মিথ্যাবিবৃতি যখন ধরা পড়ে। কিন্তু যুবক শিক্ষককে কেউ সমন পাঠায় নাই। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সত্যকথা বললে, এবং তার জন্যে শাস্তি লাভ করলে, তাকে তারা নির্বোধই বলবে।

যুবক শিক্ষক সহসা তার সহযোগীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

"মানুষটি আরামে ছিল। খাসা চাকুরি, বড়বাড়িতে জামাই-আদর। বোকা না হলে খামাখা নিজের ওপর এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে কেন?"

"তাই। কত অন্যায়-দুর্নীতির কথা মানুষ জানতে পায়। কিন্তু নিজের ভাত মারা না পড়লে নিজের ক্ষতি করে কেউ সে-সব কথা প্রকাশ করে নাকি?"

আদর্শ চরিত্র শুধু রূপকথায় বিরাজ করে, বাস্তবজগতে তার অস্তিত্ব নাই।

যুবক শিক্ষকের কোনো ক্ষতি না হলেও, এবং কাদেরের যথাযথ শাস্তি হলেও তারা যুবক শিক্ষককে উচ্চাসনে বসাবে না। তার কার্যে তারা গূঢ় অভিসন্ধি খুঁজে বের করবে।

"নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কথা আছে।" (উক্তিটি যুবক শিক্ষক বারবার শোনে নাই কি?) "তার নিরীহ গোবেচারা চেহারায় ভুলবেন না।"

"কী কথা?

"বলে দিলাম, মেয়েলোকটির সঙ্গে আমাদের মাস্টারটিরও যোগাযোগ ছিল।"

ন্যায়বানের প্রতি ক্রূরহিংসায় তাদের হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি হবে। অন্য কেউ আরেকটি সম্ভাবনার কথা বলবে।

"কোনো কারণে বড়বাড়িতে জামাইর আদর শেষ হয়ে আসছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যাদের নিমক খেয়েছে তাদেরই ক্ষতি করবার জন্যে কথাটা সে প্রকাশ করেছে।"

অকারণে কেউ ন্যায়বানের মুখাচ্ছাদন পরে না।

যুবক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কাদেরের পাল্টা অভিযোগটা প্রমাণিত হলে কারো মনে কি একবার কাদেরের দেরি করে কথাটা প্রকাশ করার বিষয়ে একটু প্রশ্ন জাগবে না? হয়তো জাগবে। কিন্তু যুবক শিক্ষক তারও একটা উত্তর শুনতে পায়।

"আহা, দরবেশ মানুষ। অতশত কী বোঝে?"

যুবক শিক্ষক তার সমর্থনে একটি কণ্ঠস্বরও শুনতে পায় না। কিন্তু জয় বা পরাজয়ের পরে তারা কী বলবে, সে-ভয়েই যে সে ভীত তা নয় : তাদের সম্ভাব্য মতামতের জন্যেও সে আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন বোধ করে নাই। তবু সে-সব কি ঘটনাটি প্রকাশ না করার পক্ষে গণ্য

কথা যায় না?

যুবক শিক্ষক কিছুক্ষণ আপন মনে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার অনুসন্ধান যেন শেষ হয়েছে। পূর্বের সিদ্ধান্তটি ত্যাগ করে নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে আর কোনো বাধা নাই। ভেতরটা কেমন হাল্কা-হাল্কাই মনে হয়, কষ্টকর আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে সে হয়তো স্বস্তিই বোধ করে।

তবু সে নিজের মনেই শেষবারের মতো দুটি প্রশ্ন না করে পারে না। যুবতী নারীর সঙ্গে কাদেরের সম্পর্কটি যখন নিন্দনীয় এবং হত্যাকাণ্ডটি যখন অতিশয় গুরুতর অপরাধ, তখন তা প্রকাশ না করে কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে কি?

যুবক শিক্ষক আবার তার সহযোগীদের চেহারা দেখতে পায়। তারা যেন কেমন গোপনভাবে হাসছে। তারপর তাদের উত্তরটা সে শুনতে পায়।

"পুরুষের ওসব দুর্বলতা একটু থাকেই। দোষটা আসলে মেয়েলোকটির। দুশ্চরিত্রা হলে এমন অপঘাত মৃত্যু অবধারিত।"

বিশ্রামঘরটা শীতল হলেও কেমন ভ্যাপসা গরম বোধ করে যুবক শিক্ষক। চারপাশটা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে যেন। হয়তো ভালো করে শ্বাস নেবার জন্যেই সে সোজা হয়ে উঠে বসলে আরবির মৌলবীর ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। আজ সে বিপরীত দিকে বসে চোখ বুজে হয়তো ঝিমুচ্ছে। যুবক শিক্ষক অকারণে তার চিন্তাশূন্য শান্ত মুখমণ্ডলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর সে বুঝতে পারে, নিজের মনে যে-সব সহযোগীদের চেহারা সে দেখেছিল তার মধ্যে মৌলবীর শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারাটি নাই। তাকে কি একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবে? হয়তো সে তাকে সমর্থন করবে। মনের ভীতির জন্যে যে-ব্যাপারটি তার কাছে অতীব গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়েছে, হয়তো সেটি তার কাছে কোনো সমস্যাই মনে হবে না। সমস্যা কোথায়? একটি খুনের কথা সে জানতে পেরেছে। সে-কথা সে প্রকাশ করবে। তাতে কোনো জটিলতা বা ভীতির প্রশ্ন নাই।

মৌলবী চোখ বুজে থাকলেও চোখের অন্তরালে তার দৃষ্টি অবিশ্রান্তভাবে এধার-ওধার নড়ে : যেন চোখ বুজেই সে সব কিছু দেখতে পায়। তারপর তার চোখের পাতা নিমীলিত থেকেই প্রজাপতির পাখার মতো ফড়ফড় করতে শুরু করে, মনে হয় চোখ খুলবে। কিন্তু এবার মৌলবীর জিহ্বাগ্র ধীরে-সুস্থে এবং নিপুণতার সঙ্গে দাঁতপাটির গুহাগহ্বরে খাদ্যকণার সন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনতিবিলম্বেই সে তার সন্ধানকার্যে সাফল্যমণ্ডিত হয়। তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার চোখমুখ নিশ্চল হয়ে পড়ে। সে কি তুচ্ছ খাদ্যকণাটির জন্যে মহান অন্নদাতার কাছে শোকর আদায় করছে?

হয়তো সেটি তার খেয়াল, তবু যুবক শিক্ষক ক্ষিপ্রগতিতে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর নিরাশায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। না, মৌলবীর মতো অসহায় ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো উপদেশ আশা করা বৃথা।

কিন্তু উপদেশের আর প্রয়োজনই-বা কী? ইতিমধ্যে তার সমস্যার সমাধান কি হয় নাই? ঘটনাটি প্রকাশ করার বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তিতর্কে সে কি সন্তুষ্ট নয়?

না, সে সন্তুষ্ট। সমস্যার সমাধান হয়েছে, আর ভাবনার কারণ নাই। কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আর নাই।

বিশ্রামঘরে আজ প্রগাঢ় নীরবতা, তর্কবিতর্ক এখনো শুরু হয় নাই। সে-নীরবতার মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি অস্পষ্ট শ্রান্তিতে চোখ বোজে। তার কি ঘুম পাচ্ছে? জোয়ারের সময় চর যেমন আস্তে, অলক্ষিতে ডুবে যায়, তেমনি তার সমগ্র অস্তিত্ব শ্রান্তির কালো জোয়ারে নিমজ্জিত হয়। না, তার আর কোনো প্রশ্ন নাই, বলবারও কিছু নাই। নিঃশব্দে সময় কাটে। কখনো কখনো কেউ কথা বললে মনে হয় তার কণ্ঠ যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে। বাইরে মাঠে খেলারত ছেলেদের চিৎকারধ্বনি অর্থহীন কোলাহলে পরিণত হয়।

Banglabook.org

তারপর একসময় যুবক শিক্ষক আস্তে চোখ খুলে তাকায়। তার দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন; কী যেন তার স্মরণ হয়েছে। একটু পর সে কারো সন্ধান করে, ধীরে ধীরে এধার-ওধার তাকায়। অবশেষে তারই বাম পাশে উপবিষ্ট সেদিনের বিজয়ী বক্তার ওপর তার দৃষ্টি থামে। সে আজ নির্বাক। নত মাথায় আঙুল দিয়ে নাক খুঁটতে খুঁটতে গভীর মনোযোগসহকারে সে একটি সংবাদপত্র পড়ে।

শীঘ্র সে পাতা উল্টাতে খস্‌খস আওয়াজে ঘরের নীরবতা ভঙ্গ হয়। যুবক শিক্ষক আর দ্বিধা করে না। বক্তাকে প্রশ্ন করে, "মেয়েলোকটার সম্বন্ধে কিছু জানা গেছে কি?"

তার আকস্মিক প্রশ্নে বিশ্রামঘরে অতি ক্ষীণ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, যেন শান্ত পানির বুকের ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে গেল। তারপর কয়েক জোড়া দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হয়।

সেদিনের খবরবিশারদ প্রথমে যুবক শিক্ষকের প্রশ্নটির অর্থোদ্ধার করতে যেন সক্ষম হয় না। সে কি এর মধ্যে এমন মুখরোচক কথাটি ভুলে গেছে?

না, তার স্মরণ হয়। বিপরীত দেয়ালের দিকে চোখ মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে নাকে একবার উচ্চ আওয়াজ করে, ডান উরুটা চুলকে নেয় বার কয়েক। তারপর সে পাল্টা প্রশ্ন করে, "কী জানা যাবে?"

যুবক শিক্ষকের গলায় ঈষৎ কাঁপন ধরবার উপক্রম করে। সরাসরি প্রশ্নটা করতে তার দ্বিধা হয়। অবশেষে অস্ফুটভাবে কেশে সে বলে, "কে তাকে খুন করেছে?"

"ও।" এবার বক্তার চোখ ক্ষিপ্রগতিতেই মিট্‌মিট্‌ করতে শুরু করে। তারপর তাতে সামান্য হাসির আভাস জাগে। যুবতী নারীর মৃত্যু সম্বন্ধে সে একটি বিচিত্র খবর দেয়।

যুবতী নারীর বৃদ্ধা মায়ের বিশ্বাস যে, হতভাগিনীর ওপর জিন-পরীর আছর পড়েছিল। একদিন দুপুরবেলায় উঠানে বসে সে শালীর চুলে উকুন দেখছিল, এমন সময় দীর্ঘকায় সাদা কিছু তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মেঘহীন আকাশে সাদা মেঘের মতো, স্তব্ধদিনে দমকা হাওয়ার মতো। কানা শালী কিছু দেখতে না পেলেও তার গায়ে হাওয়া লাগে। তবে কেমন ধরনের হাওয়া যেন। বৃদ্ধা নারী ঘরে ছিল। অকারণে তার বুকটাও কেঁপে ওঠে।

সেদিন থেকে যুবতী নারীর দশা উপস্থিত হয়। যার একবার দশা হয় সে কি আর বাঁচতে পারে?

শীঘ্র হাসির ভাবটা মিলিয়ে যায় বক্তার চোখ থেকে।

"কেন?"

কয়েক জোড়া দৃষ্টি যুবক শিক্ষকের উপর পূর্ববৎ নিবদ্ধ হয়ে থাকে।

প্রশ্নটি সে শুনতে পায় না। এবার তার মনে পরম স্বস্তির ভাব এলে সে ভাবে, শেষ বাধাটিও অবশেষে দূর হয়েছে। চাষাভূষা মানুষেরাও কথাটা গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করে। এ-বিষয়ে হন্তা-নিহতের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই।

সন্দিগ্ধ চোখে বক্তা সহযোগীদের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে আবার বলে, " কেন?"

"এমনি।" যুবক শিক্ষক কোনোপ্রকারে উত্তর দেয়। তারপর সে মাথা নত করে। মুখে ভারি কিছু নেবেছে যেন, ঠোঁটের পাশটাও কেমন বিকৃত হয়ে উঠেছে। স্বস্তির ভাবটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর হঠাৎ ঝড়ের মতো তর্কবিতর্ক শুরু হয়। হাসিভরা চোখে বক্তা যে-কথাটি বলেছিল, সে-বিষয়ে অনেকের মৌলিক কিছু বলবার আছে।

তারপর যুবক শিক্ষক তার হাত দুটি টেবিলের তলায় লুকায়। তার ভয় হয়, হয়তো তার হাত কাঁপতে শুরু করবে।

BanglaBook.org

পনেরো

দাদাসাহেব ফজরের নামাজ শেষ করে কারুকার্যময় রেহালে কোরান শরীফ রাখবেন এমন সময় একটি চাকর দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। এ-সময়ে তাঁর ধর্মীয় কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তিনি বিরক্ত বোধ করেন বলে চশমার ওপর দিয়ে অসন্তুষ্টদৃষ্টিতে তার দিকে তাকান।

"মাস্টার দেখা করতে চায়।"

দাদাসাহেবের মুখ থেকে অসন্তুষ্ট ভাবটি মিলিয়ে যায়। একটু ভেবে তিনি বলেন, "যাও, আসছি।"

চাকরটি অদৃশ্য হয়ে গেলে জরির কাজ-করা গাঢ় লালরঙের মখমলের সুদৃশ্য আবরণে কোরান শরীফ ভরে সেটি বুকের কাছে ধরে কতক্ষণ তিনি নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন, মুখে একটু দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা দেয়। তাঁর সন্দেহ থাকে না যে, যুবক শিক্ষক কাদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে এসেছে। কিন্তু কী কথা?

কাদের এবং যুবক শিক্ষকের মধ্যে হঠাৎ দেখাশুনা হলে তিনি কৌতূহলী হয়ে সেদিন যুবক শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তাদের দেখাশোনার কারণ যুবক শিক্ষকের নিকট হতেই জানা সহজ হবে। কিন্তু সে কিছু বলতে রাজি হয় নাই। তার আচরণ এবং না-বলতে চাওয়ার অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নাই। কী এমন কথা হতে পারে যা বলতে তার এত দ্বিধা? অকারণে কাদেরের সেদিনের বিচিত্র দৃষ্টিও তাঁর স্মরণ হয়। সে-দৃষ্টির অর্থও তিনি এখনো বুঝতে পারেন নাই।

কাদের দরবেশ সে-কথা তিনি নানা সময়ে বলে থাকেন বটে কিন্তু তাতে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন, তা নয়। তিনি নিজেই জানেন, তা তাঁর একটি খেয়াল মাত্র। তবে এমন একটি খেয়াল যা কাদেরের মতো মানুষের পক্ষে সত্য হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তার আচরণ-ব্যবহার দশজনের মতো নয়। সাধারণ জীবনের নক্‌শার সঙ্গে তার জীবনের মিল্‌জুক নাই। তার সম্বন্ধে তার বড় ভাইয়ের ভাবনাচিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। তাই একদিন তিনি আশা করতে শুরু করেন, হয়তো কাদেরের মন দরবেশীতেই। আশাটি সত্য হলে তার আচরণের একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হবে, ভাবনাচিন্তারও কারণ থাকবে না। ক্রমশ আশাটি একদিন খেয়ালে পরিণত হয়। প্রথমে-প্রথমে সে-রসিকতা-অবিশ্বাসের অংশটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষক তাঁর সে আশা-খেয়াল ভাঙতে এসেছে কি?

অবশেষে সজোরে কেশে গলা সাফ করে তিনি উঠে দাঁড়ান। না, এমন আশঙ্কা অহেতুক।

রেহালটি প্রশস্ত বিছানায় স্থাপিত জায়নামাজের ওপর পড়ে থাকে, তবে কোরান শরীফটা তিনি খাটের মাথার কাছে তাকের ওপর সযত্নে তুলে রাখেন। তারপর গলার মাফলারটি ভালো করে পেঁচিয়ে আলোয়ানটাও আরেকবার জড়িয়ে নেন। এ-সময়ে মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ কেমন একটি কথা তাঁর মনে আসে। তিনি ভাবেন, না, তাঁকে কাদের সম্বন্ধে কোনো কু-কথা বলার সাহস যুবক শিক্ষকের হবে না। অবশ্য তৎক্ষণাৎ সেটিকে মন থেকে দূর করে তিনি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

শূন্য বারান্দায় নিশ্চল হয়ে বসে যুবক শিক্ষক দাদাসাহেবের জন্যে অপেক্ষা করে। একটু দুর্বল দেখালেও মুখ শান্ত। নিদ্রাহীনতার জন্যে চোখে শুষ্কতা কিন্তু তাতেও অস্থিরতা-বিহ্বলতার স্পর্শ নাই। মেঝের সাদা-কালো ছকের দিকে তাকিয়ে ধীর-স্থির ভাবেই সে ভাবে, অবশেষে দাদাসাহেবকে দুঃসংবাদটি দিতে এসেছে। দুঃসংবাদটি এই যে, কাদের একটি যুবতী নারী খুন করেছে। কিন্তু কেবল দুঃসংবাদটি দিতেই কি সে এসেছে? বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি আসলে বড় অস্পষ্ট মনে হয়। শুধু তা-ই নয়। যা সে বলতে এসেছে এবং যা দাদাসাহেবকে নিঃসন্দেহে ক্রুরভাবে আঘাত দেবে, তা যেন ঘটনাটির সঙ্গে অতি ক্ষীণভাবে

BanglaBook.org

জড়িত। যা সে বলতে এসেছে আর যা ঘটেছে, সে দুটি পৃথক বিষয় যেন। হত্যাকাণ্ড নয়, কাদের যেভাবে তার সামনে স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে নিজেকে ধ্বংস করেছে সেটাই বড়। কাদের যখন নিম্নতম সোপানে এসে নাবে তখন তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই : কেবল থেকেছে সামান্য বিষাক্ত কালো ধুঁয়া, হয়তো একটা দূষিত ছায়া।

না, তার ধ্বংস হওয়াটাও আর বড় কথা নয়। বাঁশঝাড়ের ঘটনার মতো সেটিও যেন আবছা হয়ে উঠেছে। যুবক শিক্ষক এখন কেবল একটি কথাই বোঝে। কাদের অবশেষে যে বিষাক্ত ধুঁয়ায় এবং দূষিত ছায়ায় পরিণত হয়েছিল, সে-ধুঁয়া এবং ছায়া যুবক শিক্ষককেও যেন গ্রাস করার উপক্রম করেছিল।

মনের কথা বোঝা মুশকিল। বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি কেন তার মনে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল তা সে এখনো সঠিকভাবে জানে না। হয়তো হত্যাকাণ্ডের কথাটি তার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হয় নাই। এমন নির্মম কথা বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক। অথবা বিশ্বাস না-করাই সম্ভব হয় নাই। তাই কথাটা প্রকাশ করলে তার সমূহ ক্ষতি হতে পারে সে-কথা কাদেরের নিকট হতে শোনার আগেই নিজেকে বুঝতে পেরে স্বপ্নরাজ্যে সে আশ্রয় নিয়েছিল। দুটির ফল কিন্তু একই : ঘটনাটির বিষয়ে তার নীরবতা এবং দুটিই যে-কোনো একটির সাহায্যে তার পক্ষে সর্বপ্রকার আত্মরক্ষা করাও সম্ভব হত : মনটা নিষ্কলঙ্ক থাকত, কোনোপ্রকার ক্ষতিও হত না। কিন্তু কোনোটাই ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে নাই, স্বপ্নরাজ্যে বাস করাও সম্ভব হয় নাই।

কেন? কারণ নিজের কাছে তার মনের ভয় লুকানো আর সম্ভব হয় নাই। আয়নায় একটি নগ্নভীতি দেখতে পায়; তার সন্দেহ থাকে না যে সেটি তারই প্রতিবিম্ব। তার কার্যের পরিণাম সম্বন্ধে এখনো সে ভীত, কিন্তু কাজটি না করে এখন তার উপায় নাই। ভয়টা যে তারই মনের ভয়, সে-কথা সে এখন জানে।

পরিণামভীতি না কাটা সত্ত্বেও সে যখন কথাটি প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে তখন কোনো একটি যুক্তির সাহায্যে সে নিশ্চয়ই তার ভীত মনকে মানিয়েছে। হ্যাঁ, যুক্তি একটা আছে বটে, কিন্তু হয়তো সেটি একটু বিচিত্র। দাদাসাহেবকে তা সে বোঝাবার চেষ্টা করবে। তাহলে তিনি একথাও বুঝতে পারবেন যে, সে তাঁকে কাদের সম্বন্ধে একটা নিষ্ঠুর খবরই দিতে আসে নাই। তারপর তাঁর পক্ষে যুবক শিক্ষককে খানিকটা ক্ষমা করাও হয়তো সম্ভব হবে।

গতকাল স্বচ্ছদৃষ্টিতে পরিণামের সম্ভাবনাগুলি ভেবে সে ভয়ই পেয়েছিল। তারপর সে একটি কথা জানতে পারে। কথাটি এই যে, যুবতী নারীর আত্মীয়-স্বজন হত্যার অপরাধটি জিন-পরীর ঘাড়ে চাপানোই শ্রেয় মনে করেছে। হত্যাকারী কে তা না-জানলেও হত্যার কথা সন্দেহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই; মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সরকারি ডাক্তারের রায়ের মধ্যে জিন-পরীর নামগন্ধ পর্যন্ত নাই। তবে কেন তারা জিন-পরীর নাম তুলেছে? কারণটি হয়তো এই যে, মৃত যুবতী নারীকে আর যখন তারা ফিরে পাবে না তখন তার মৃত্যুর অপ্রীতিকর ব্যাপারটি ঘাঁটিয়ে লাভ নাই। আত্মীয়-স্বজনের এমন বাসনা স্বাভাবিক।

এমন সময় যুবক শিক্ষক একটি বিচিত্র কথা লক্ষ করে। কথাটা সত্যিই বিচিত্র। (প্রথমে ঘটনাটি প্রকাশ না করার জন্যে সে যেমন অদ্ভুত যুক্তি-অজুহাতের সাহায্য নিয়েছিল, এবার তা প্রকাশ করবার জন্যেও কি তেমনি অদ্ভুত যুক্তি-অজুহাতের সাহায্য নিচ্ছে?) সে দেখতে পায় যে, সব যুক্তি কাদেরের, তার নিজের, এমন কি যুবতী নারীর মৃত্যুতে একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তার আত্মীয়-স্বজনের—সব যুক্তিই সত্য ঘটনাটি গোপন রাখার পক্ষে। সহসা তার মনে হয়, এই ঐকতানের মধ্যে একটি নিগূঢ় অর্থ আছে যেন।

না-বলার পক্ষে অতি আগ্রহের সঙ্গে কারা সে-সব যুক্তি জুগিয়ে দিয়েছে? জীবিত মানুষরা। জীবিত মানুষরা তাদেরই কথা বলছে, মৃত মানুষের কথা বলছে না। তারপর

BanglaBook.org

আরেকটি কথা সে বুঝতে পারে। জীবিত মানুষের পক্ষে জীবিত থাকার জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা, বা জীবন থেকে যতটুকু পারা যায় লাভ–সুবিধা আদায় করার তীব্র বাসনা আপত্তিজনক নয়, কিন্তু যারা যুক্তিগুলি পেশ করেছে তারা যেন নামেই শুধু জীবিত। আসলে তারা মৃত, তাদের জীবনও ধার–করা জীবন। তা না–হলে তারা মৃত নারীর প্রতি কোনো সমবেদনা বোধ করবে না কেন, যে–মানুষ তার মৃত্যু ঘটিয়েছে তার প্রতি তীব্র ঘৃণা বোধ করবে না কেন? জীবনের ব্যাপারে তারা প্রতারক বলেই তাদের মনে এত ভীতি, সত্য ঘটনাটি লুকাবার জন্যে এত অধীরতা, এত শঠতা।

যুবক শিক্ষক শীঘ্র সে–দল থেকে কাদেরকে এবং যুবতী নারীর আত্মীয়–স্বজনকে বাদ দেয় : ঘটনাটি গোপন রাখার ইচ্ছাটি তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য যুক্তিগুলি সে কোথায় শুনেছে? কাদের ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সে যখন আলাপ করে নাই, তখন সে–সব সে কি নিজের মনে শোনে নাই?

তার মানে এই নয় কি যে যুবক শিক্ষক নিজে জীবিত হয়েও মৃত, জীবনের ব্যাপারে সে–ই প্রতারক?

আয়নায় সে যেন নিজের আরেকটি চেহারা দেখতে পায়। তাহলে বাকি কথাও সত্য। কর্তব্য এড়াবার জন্যেই সে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করেছিল এবং নিজেরই সৃষ্ট অবিশ্বাস্য যুক্তি–অজুহাতে সে বিশ্বাস করেছিল। কাদের যে হত্যাকারী বা সে যে প্রেমিক নয় সে–কথা জানার পর তার মধ্যে যে–ভীষণ ক্রোধ দেখা দিয়েছিল তার কারণ অপরাধীর প্রতি ঘৃণা নয়, কাদের তাকে স্বপ্নরাজ্যে বাস করতে দেয় নাই বলেই সে এমন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, এ–কথাও সত্য যে যুবতী নারীর মৃত্যুর বীভৎসতা সে কিছুক্ষণের জন্যে বোধ করলেও তার প্রতি কোনো দুঃখ হয় নাই বা তার প্রতি গভীর অন্যায়টির সুবিচার হোক তার প্রয়োজন বোধ করে নাই। সে শুধু ভয়ই বোধ করেছে, নিজের জীবনের জন্য ভয়। সে–ভয়েই প্রথম রাতে মাঠে–মাঠে এমন উন্মাদের মতো ছুটাছুটি করেছিল এবং এ–ক'দিন এমন দিশেহারা হয়েছিল।

নিজের সত্যরূপ সে কী করে সঠিকভাবে জানবে?

কথাটি জানবার একটি পথই আছে। তার সত্যাসত্য বিচার ঘটনাটি প্রকাশ না করলে সম্ভব নয়। আবার, সে–বিষয়ে একটি পরিষ্কার উত্তর চাইলে মূল্যস্বরূপ দুটি পরিণামের জন্যে তাকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে : হয় কাদের শাস্তি পাবে, না হয় সে–ই শাস্তি পাবে।

তারা যেন দু–জনেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে আর প্রভেদ নাই।

না, দাদাসাহেবের কাছে সে কাদেরের কথাটিই কেবল বলতে আসে নাই।

হয়তো এখনো সে অন্যপ্রকারে স্বপ্নরাজ্যেই বাস করছে, নিজেকে ফাঁকি দেবার নূতন একটি পন্থা আবিষ্কার করেছে। তার একথা মনে হয় যে, সে যেন নিজেকেই কোনোপ্রকারে ভুলিয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের গুহায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু তার মনে হয়, সে যেন ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, কোথাও আশ্রয় নেবার স্থান নাই বলেই মনে বিচিত্র শান্তিও। বস্তুত, মন যেন শান্ত নদীর মতোই ঢেউশূন্য, মসৃণ। নদী তবু প্রবাহিত হয়। সে যেন নদীর মতোই একটি গন্তব্যস্থলের দিকে ভেসে যাচ্ছে। সে–গন্তব্যস্থল সে দেখতে পায় না, সেখানে তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর আছে কিনা তা–ও সে জানে না। তবে নদীর ধারা যেমন থামানো যায় না বা তার দিক্‌পরিবর্তন করা যায় না, তেমনি তার পক্ষে থামা বা দিক্–পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

ভেতরের সিঁড়িতে দাদাসাহেবের খড়মের আওয়াজ শোনা যায়। সে–আওয়াজ ক্রূরভাবে সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়। আচমকা সে–আওয়াজ শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যুবক শিক্ষক বেসামাল হয়ে পড়ে, তার শান্তমনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। দাদাসাহেবকে কথাটি বলতে এসে সে ভুল করে নাই তো? আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে নিস্তার পাওয়ার প্রয়াসে সে কি

আত্মহত্যা করতে বসেছে?

মনকে সংযত করার চেষ্টা করে সে আপন মনে বলে, না। ভীতির কোনোই কারণ নাই। দাদাসাহেব তার অসহায়তা বুঝতে পারবেন। যে-স্রোতের বিরুদ্ধে সে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু দাঁড়াতে পারে নাই এবং যে-স্রোতে সে এখন ভেসে যাচ্ছে—দুটির কোনোটার অর্থই সে বোঝে না। এমন নিঃসহায় মানুষের জন্যে তাঁর নিশ্চয় দয়া হবে।

দাদাসাহেবের খড়মের উচ্চ আওয়াজে উদ্বেগের আভাস নাই। হয়তো তাতেই সে অবশেষে আশ্বস্ত হয়, তার মনের আলোড়ন শান্ত হয়। তারপর দাদাসাহেব বারান্দায় উপস্থিত হলে সে সসম্মানে উঠে দাঁড়ায়, তিনি সশব্দে আসন-গ্রহণ করলে সে-ও আবার বসে। তারপর সে খোলা দরজা দিয়ে উঠানের দিকে তাকায়। সেখানে অস্পষ্ট ঈষৎ কুয়াশাচ্ছন্ন রোদ দেখা দিয়েছে। একধারে একটি ব্যস্তসমস্ত সাদারঙের মুরগি চঞ্চলভাবে খাদ্য অন্বেষণ করে। দাদাসাহেব কাশেন।

কোথায় সে শুরু করবে? নদীর উৎস কোথায়, কোথায়ই-বা জীবন-মৃত্যুর উৎপত্তি? তাছাড়া, জীবন কি সত্যিই মৃত্যুর চেয়ে অধিকতর মূল্যবান?

দাদাসাহেব আবার কাশেন। তিনি অপেক্ষা করছেন সে-কথা যুবক শিক্ষককে জানান। যুবক শিক্ষক বোধ করে, তার ভেতর ঝরঝর করে কী যেন ঝরতে শুরু করেছে। তার অন্তর কি কাঁদতে শুরু করেছে একটি নিঃসহায় অজ্ঞানতার জন্যে?

তারপর সে অস্পষ্ট গলায় বলে, "কাদের মিঞা একটি মেয়েলোককে খুন করেছে।"

কথাটি বলার পরও তার ভেতরে সে-অজানা ধারাটি ঝরতে থাকে। ধারাটি ঝরতেই থাকে, ঝরঝর করে ঝরতেই থাকে। অবশেষে সব কিছু ক্রমশ শেষ হয়ে যায়। নিঃস্ব শূন্যতায় কোনো শব্দ হয় না।

বহুক্ষণ পর যেন নীরবতা ভঙ্গ করে দাদাসাহেব আস্তে বলেন, "বুঝলাম না।"

যুবক শিক্ষক তখন দৃষ্টিহীনভাবে ছককাটা মেঝের দিকে তাকিয়ে নিঃস্পন্দভাবে বসে। পূর্ববৎ কণ্ঠে সে কথাটি আবার বলে। তারপর কতক্ষণের জন্যে নীরবতা অবিচ্ছিন্ন থাকে।

"পরিষ্কার করে বলেন।"

দাদাসাহেবের কথা ভালোভাবে বুঝবার ক্ষমতা না থাকলেও সে বোঝে, তিনি হয়তো ঘটনাটির বৃত্তান্ত জানতে চাইছেন। অনুচ্চ প্রাণহীন কণ্ঠে সে বাঁশঝাড়ের ঘটনাটির বৃত্তান্ত দিতে শুরু করে। কিন্তু শীঘ্র তার মনে হয়, তার শ্রোতা যেন নাই। তার কথা এলোমেলো হয়ে ওঠে। একবাক্যে যা বলেছে তার ব্যাখ্যা-সম্প্রসার হয়তো তার কাছে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হয়। বস্তুত, দাদাসাহেবকে আর কোনো কথা বলার প্রয়োজনই সে বোধ করে না। হঠাৎ লম্বা-চওড়া সম্ভ্রান্ত মানুষটি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। তাছাড়া, কোনো কথা জানার কৌতূহলও যেন শেষ হয়ে গেছে।

একটু পরে বিসদৃশভাবে উঠে দাঁড়িয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে যুবক শিক্ষক বলে, "আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

গাঢ় নিঃশব্দতার মধ্যে তার কথাটা কেমন বেখাপ্পা শোনায়। হয়তো তা সে নিজেই অনুভব করে। তবু কয়েক মুহূর্ত সে অপেক্ষা করে। দাদাসাহেব নীরব হয়ে থাকলে সে এবার হাল্কা-পায়ে বারান্দা অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। প্রস্থানটিও কেমন বেখাপ্পা মনে হয় যেন, কিন্তু সে-কথা বুঝলেও সে থামে না। উঠানে মুরগিটি সচকিত হয়ে ডানা তুলে পলায়নোদ্যত হয়, উচ্চ কর্কশ রব তোলে, কিন্তু নড়ে না।

ঘরে সব তৈরি। ফুলতোলা টিনের সুটকেসটি কেবল হাতে তুলে নিলেই হয়। তবে মাথাটা কেমন শূন্য শূন্য মনে হয় বলে কতক্ষণ ঘরের মধ্যখানে স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। যে-ঘরে সে দু-বছর বসবাস করেছে, সে-ঘরের চারধারে একবার তাকিয়ে দেখার ব্যর্থ চেষ্টা

BanglaBook.org

শোনে, কিছু দেখতে পায় না। মনে কোনো বেদনার ভাবও বোধ করে না।

তারপর সে সুটকেসটি তুলে নেয়। কর্তব্য কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। দু-ক্রোশ দূরে আদালতের সামনে ঘাসশূন্য বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের এককোণে যে-থানা, সে-থানায় তাকে যেতে হবে। কথাটা কর্তৃপক্ষকে বলার দায়িত্ব তারই। কাদেরের বড় ভাইয়ের ওপর সে-দায়িত্বের ভার দেওয়ার মানে কর্তব্য শুধু অসম্পূর্ণ রাখাই নয়, তাঁকে অমানুষিক একটি কাজ করতে বলা।

উঠানে নেবে বড়বাড়ির দিকে না তাকিয়ে সে হাঁটতে শুরু করে। তারপর যে-বাড়ি মূর্ছিত হয়ে আছে মনে হয়েছিল সে-বাড়ি থেকে এবার গুরুগম্ভীর একটা ডাক আসে। সে-ডাকটির জন্যে তারই অজ্ঞাতে সে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। অবশেষে সেটি যখন তার কানে পৌঁছায়, তখন সে হয়তো আর তার জন্যে তৈরি নয়, বা তাতে তার মনে একটা নতুন ভয়ের সৃষ্টি হয়।

সে ছুটতে শুরু করে। হাঁটার ভঙ্গিতে চললেও আসলে সে দৌড়তেই থাকে। টিনের সুটকেসটি সশব্দে হাঁটুতে বাড়ি খায়।

ষোল

আদালতের সামনে ঘাসশূন্য বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণটি অতিক্রম করে দু-দিন আগে স্ব-ইচ্ছায় যে-ঘরে সে এসেছিল, আজ সে-ঘরেই তারা তাকে নিয়ে এসেছে। টেবিলের ওপাশে সেদিনের মতো উপরিতন পুলিশ-কর্মচারীটিও যথাস্থানে বসে। ছোটখাটো মানুষ, দেখতে নিরীহ। সামনের দাঁত অসমান, নিচের ঠোঁটটা ভারি। তাই হয়তো মুখ খুলে রাখার অভ্যাস। তবে একটা স্থায়ী ভ্রূকুটির জন্যে তার মুখের শিথিলতা কিছু রক্ষা পায়।

তাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে পুলিশ-কর্মচারী চোখ তুলে তাকায়। দেখতে-না-দেখতে তার চোখে-মুখে বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হয়। তার ভ্রূকুটি গাঢ় হয়ে ওঠে, দৃষ্টিতে ক্ষীণ ধার দেখা দেয়। সন্দেহের অবশ্য কোনো অবকাশ ছিল না, তবু যুবক শিক্ষকের মন থেকে এবার সব সন্দেহ দূর হয়। কিন্তু তার মুখে ভাবান্তর ঘটে না। সেদিনের ঘরটি এবং টেবিলের ওপাশে পুলিশ-কর্মচারীকে সে যেন বহুদূর থেকেই দেখে। তার দৃষ্টি স্বচ্ছ, তবু কিছুই নিকটে মনে হয় না। পুলিশ-কর্মচারীটি সাব-ইন্সপেক্টরের দিকে তাকায়। সাব-ইন্সপেক্টরের পেছনে দণ্ডায়মান কনস্টেবলটির বুটে আওয়াজ হয়।

“বসেন।” পুলিশ-কর্মচারী সাব-ইন্সপেক্টরকে বসতে বলে। সাব-ইন্সপেক্টর বসলে তার মধ্যে সর্বপ্রথম স্বচ্ছন্দতা আসে। তার বয়স বেশি নয়।

“ঘরেই ছিল। পালাবার চেষ্টা করে নাই।” অল্পবয়স্ক সাব-ইন্সপেক্টরটি বলে।

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, সে-ই উক্তিটির বিষয়বস্তু। তবু তার মনে হয়, সাব-ইন্সপেক্টর অন্য কোনো মানুষের কথা বলছে যেন। অপরিচিত কোনো মানুষ ঘরেই ছিল, পালাবার চেষ্টা করে নাই।

ততক্ষণে পুলিশ-কর্মচারির দৃষ্টি তার ওপর আবার নিবদ্ধ হয়েছে। সে-দৃষ্টিতে প্রবঞ্চিত মানুষের ক্রোধভাব যেন। যুবক শিক্ষক এবারও বোঝে যে, সে-ই তার ক্রোধের কারণ। কিন্তু তাতে বিচলিত না হয়ে নিস্পৃহ-নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় সরকারি ক্ষমতাপত্র সমেত অল্পবয়স্ক সাব-ইন্সপেক্টর এবং দু'জন বন্দুকধারী কনস্টেবল সকালবেলায় তার বাড়িতে উপস্থিত হলেও সে বিচলিত হয় নাই। বরঞ্চ তাদের আগমন, তারপর সুটকেস হাতে তাদের সঙ্গে থানা অভিমুখে যাত্রা—সবই তার কাছে বারবার মহড়া-দেয়া অভিনয়ের মতো সুপরিচিত মনে হয়েছে। পুলিশ-কর্মচারীর চোখে এখন সে যে-ক্রোধ দেখতে পায়, সে-ক্রোধও অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। তাছাড়া, সে-ক্রোধ সত্য নয়

BanglaBook.org

যেন। আসলে তা বর্তমান অভিনয়ের একটি অংশমাত্র।

শীঘ্র যুবক শিক্ষক কেমন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। তখনো সে ফুলতোলা সুটকেসটি হাতে করে দাঁড়িয়ে। সে-সুটকেসটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে যেন। সে বুঝতে পারে না সেটি কোথায় রাখবে। কনস্টেবলটি তার সমস্যার কথা বুঝে তার হাত থেকে সুটকেসটি তুলে নিয়ে দেয়ালের পাশে রাখে। ঘরের নিঃশব্দতায় শক্ত বুটের অজস্র আওয়াজ হয়।

পুলিশ-কর্মচারীর রাগ পড়ে, ভ্রূকুটিটাও ক্ষণকালের জন্যে অন্তর্ধান করে। সে যুবক শিক্ষককে বলে, "বসেন।"

বসার অনুরোধটি মহড়ায় যেন বাদ পড়েছিল। তাই যুবক শিক্ষকের বসতে কিছু দ্বিধা হয়। তারপর আস্তে বসে পড়ে সে টেবিলের তলে আলগোছে হাত কচলাতে শুরু করে। তারপর সে অপেক্ষা করে।

পুলিশ-কর্মচারীর মুখমণ্ডলে ক্রোধভাব-কঠিনতা এবং ভ্রূকুটি ফিরতে দেরি হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ধম্‌কে বলে ওঠে, "চালাকি করতে চেয়েছিলেন? না, চালাকিতে কাজ হয় না।"

যুবক শিক্ষক তার ভর্ৎসনা শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। হয়তো অভিনয়ে তার বলার সময় এখনো আসে নাই বলেই সে নির্বাক হয়ে থাকে। বাইরে আদালতের সামনে মামলাবাজদের কলরব তার কানে লাগে।

পুলিশ-কর্মচারী চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণভাবে যুবক শিক্ষককে কয়েক মুহূর্ত পরীক্ষা করে দেখে। নিচের ঠোঁটটা অভ্যাসমত ঝুলেই থাকে। তারপর হঠাৎ টেবিলে হাত পিটিয়ে বাঘা-গলায় আবার সে আগের কথাই একটু ঘুরিয়ে বলে, "ভেবেছিলেন চালাকি করে পার হয়ে যাবেন?"

এবারও যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না। সব কথা জেনে পুলিশ-কর্মচারী অর্থহীন কথা বলছে। সেটাও অভিনয়ের অংশ। এখানে যুবক শিক্ষকও একজন অভিনেতা। তবে যথানির্দিষ্ট সময়েই সে কথা বলবে।

তার নীরবতা পুলিশ-কর্মচারীর পছন্দ হয় না। টেবিলে দু-হাত চেপে সামনে ঝুঁকে থুত ছিটিয়ে আবার সে বলে, "কী, অপরাধ স্বীকার করতে রাজি আছেন?"

এবার একটা উত্তর না দিয়ে উপায় নাই। তবে প্রশ্নটির মতো উত্তরটিও তার মুখস্থ বলে কোনো দ্বিধা না করে সে ক্ষুদ্র গলায় তার বক্তব্য বলে। কিন্তু তার বক্তব্যটি শুনে পুলিশ-কর্মচারীটি অকস্মাৎ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়ে। সেটাও অভিনয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু তার ক্রোধের ঝাপটা গায়ে লাগে বলে যুবক শিক্ষক ঈষৎ চমকে ওঠে।

"সত্য কথা!" পুলিশ-কর্মচারী আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।

যুবক শিক্ষক তার বক্তব্যটি আবার বলে, ক্ষুদ্র নিস্তেজ কণ্ঠে। সেদিন সে সত্য কথাই বলেছিল।

পুলিশ-কর্মচারী কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাক্‌শূন্য হয়ে পড়ে যেন। বাক্‌শক্তি ফিরে এলে সে এবার গভীর বিরক্তির সঙ্গে বলে, "তদারক হবে। কিন্তু আপনার তাতে লোকসান বই লাভ নাই।"

যুবক শিক্ষক এবার নীরব হয়ে থাকলে পুলিশ-কর্মচারী সহসা হয়তো বুঝতে পারে না, সে কী বলবে। ভাগ্যবশত এমন সময় একটি ছেলে দু-পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। এক পেয়ালা পুলিশ-কর্মচারীর জন্যে দ্বিতীয় পেয়ালা সাব-ইন্সপেক্টরের জন্যে। এক চুমুক দিয়ে উপরিতন কর্মচারীটি পকেট থেকে একটা আধা-ভরা সিগারেট-প্যাকেট বের করে একটি সিগারেট ধরায়। মুহূর্তের মধ্যে তার গন্ধে ঘরটা ভরে ওঠে।

গন্ধটা নাকে লাগতেই যুবক শিক্ষক সন্তর্পণে তা বার-দুয়েক ঘ্রাণ করে দেখে, তারপর তার মনের অন্তরালে কোথাও ঈষৎ বেদনার ভাব দেখা দেয়। কাদেরের কথা তার মনে পড়ে।

BanglaBook.org

সে-রাতে কাদের তাকে একটি সিগারেট দিয়েছিল। সে-কথাটাই স্মরণ হয়। না, কাদেরের কথা যে স্মরণ হয়, তা নয়। কাদের যেন তার মন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে সিগারেটের গন্ধটি একটি দৃঢ়জীবনের স্মৃতিই যেন জাগায় তার মনে। সে-রাত আর আজকার মধ্যে এতই কি ব্যবধান?

চা-এ আরো কয়েকবার চুমুক দিয়ে পুলিশ-কর্মচারী কণ্ঠস্বর নিচতম খাদে নাবিয়ে অন্তরঙ্গভাবে বলে, "আপনি মাস্টার। কথাটা বুঝতে দেরি হবে না আপনার।"

পরম হিতৈষীর মতো সে একটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু সহৃদয় বক্তৃতা শুরু করে। প্রথমে তার দিকে নিষ্পলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক কান দিয়েই তার কথা শোনে। তারপর বিস্ময়ে তার মন ভরে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে, পুলিশ-কর্মচারী তাকে সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মতো ব্যবহার করতে বলে যে-সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করছে, সে-সব যুক্তিতর্ক সে যে শুধু জানে তা নয়, সে-সব নিজেই সে ভেবে দেখেছে। পুলিশ-কর্মচারী নূতন কিছুই বলছে না; যা সে বলছে যুবক শিক্ষক তার মহড়া দিয়েছে অনেকবার। তার কার্যের কী পরিণাম হবে, কেন হবে, কী কী ভাবে হবে—সে-সব কথা উপলব্ধি করে তার ভীতির শেষ থাকে নাই। সে-ভীতি এখনো যায় নাই। তবে তা এমনই এক ধরনের ভীতি যা শরীরে কোথাও গভীর ক্ষতের মতো লেগে আছে, তা উপড়ানোও যায় না অস্বীকার করাও যায় না। এমন ভয়কে মেনে নিয়ে ভুলে যাওয়াই ভালো।

পুলিশ-কর্মচারীর কথা শুনে অকস্মাৎ সে একটা অপরিসীম তৃপ্তিও বোধ করতে শুরু করে। সে কি তার মনের যুক্তিতর্কের কথা অপরের মুখে শুনছে না? এ কি তার বিচক্ষণতা এবং পরিণামদর্শিতার প্রমাণ নয়?

ভ্রূকুটি করে পুলিশ-কর্মচারী প্রশ্ন করে, "শুনছেন আমার কথা?"

সচকিত হয়ে যুবক শিক্ষক উত্তর দেয়, কিন্তু পুলিশ-কর্মচারী তাকে ভুল বোঝে। তার চোখে প্রথমে সন্দেহ, শেষে কেমন যেন অহেতুক প্রতিহিংসার ভাব দেখা দেয়। বিকৃতকণ্ঠে সে বলে, "হবে, তদারক হবে। আপনার ভালো হতে পারে, মন্দও হতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। যার ক্ষতি করতে চান, তার ক্ষতি করা সহজ হবে না।"

সে যে কারো ক্ষতি করতে চায় না, সে-কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলেও শেষপর্যন্ত সে কিছুই বলতে পারে না। এক কথায় উক্তিটির উত্তর দেয়া যায় না। তাছাড়া, কী একটা কথা সে বুঝতে চেষ্টা করে বলে কোনো উত্তর তৈরি করাও তার পক্ষে হয় না।

নিজেকে কিছুটা সংযত করে পুলিশ-কর্মচারী আবার বলে, "হয় অপরাধ স্বীকার করেন, না হয় আজগুবি কথাটা ছাড়েন।"

সাব-ইন্সপেক্টরও এবার তার উপরিতন কর্মচারীকে সমর্থন করে বলে, "নিজের মন্দ না চাইলে আজগুবি কথাটা ছাড়াই ভালো হবে।"

তাদের কথা যুবক শিক্ষকের কানে আর পৌঁছায় না। তার মন অন্যত্র। তার মনের তৃপ্তির কারণ সে বুঝতে পেরেছে। বিচক্ষণতা-পরিণামদর্শিতার প্রমাণ পেলে তৃপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সে-জন্যে সে তৃপ্ত নয়। তার তৃপ্তির কারণ এই যে, মনে-মনে যে-সব সম্ভাবনা সে দেখেছিল, তা সত্যে পরিণত হয়ে তার সিদ্ধান্তকে অর্থপূর্ণ করেছে। কথাটা অত্যন্ত বড় মনে হয় তার কাছে। তার মনে যে তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, সে-দ্বন্দ্বের ভিত্তি কাল্পনিক ভয় নয়। তাছাড়া, যে-সংগ্রাম পরের বিরুদ্ধে মনে হলেও আসলে নিজেরই বিরুদ্ধে ছিল, সে-সংগ্রামে সে জয়লাভ করেছে।

তার তৃপ্তির ভাবটি স্থায়ী হয় না। এক প্রকার প্রাকৃতিক আলোড়নে নদী যেমন হঠাৎ শুকিয়ে যায়, তেমনি তার মন থেকে সব ভাববোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। সে তার উত্তর পেয়েছে। কিন্তু সে উত্তরটি চতুর্দিকে মরুভূমির সৃষ্টি করে যেন।

BanglaBook.org

দূর থেকে পুলিশ–কর্মচারীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

“বুঝতে পারছেন? হোক আপনার কথা সত্য, কিন্তু সাক্ষী কই? আপনি নিজের চোখে কিছু দেখেন নাই, কিন্তু অপর পক্ষ দেখেছে।” সে যেন একটু দ্বিধা করে। তারপর বলে, “আপনাকে স্বচক্ষে দেখেছে।”

হয়তো কথাটি পুলিশ–কর্মচারীর নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, কিন্তু সে কী করতে পারে? ব্যক্তিগত বিশ্বাস–অবিশ্বাসের মূল্য কী?

ক্ষীণভাবে পুলিশ–কর্মচারীর কণ্ঠস্বর যুবক শিক্ষকের কানে পৌঁছালে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করে। যেন সে কথাটি প্রথম বার বলছে। কিন্তু তার দ্বিতীয় বক্তব্য নাই। একই কথা বারবার বলছে সে–কথা বুঝলেও সে অপ্রস্তুত বোধ করে না।

“সত্য কথা!” ব্যঙ্গের সুরে পুলিশ–কর্মচারী চিৎকার করে ওঠে। ব্যঙ্গটি যুবক শিক্ষককে স্পর্শ করে না। সে আপন–মনে একটি দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করে। যে–দৃশ্যটি মন থেকে এ–ক'দিন ঠেকিয়ে রেখেছে, সে–দৃশ্যটিই সে দেখবার চেষ্টা করে। অল্প চেষ্টাতে দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাঁশঝাড়ে যুবতী নারীর দৃশ্য। একটু পরে সে বোঝে, কিছুই সে স্পষ্টভাবে দেখতে পারছে না। কী করে দেখতে পারবে? দু–রাতের এক রাতেও সে–প্রাণহীন দেহটির দিকে ভালো করে তাকাবার সাহস তার হয় নাই। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যেই সে তার দিকে তাকাতে সক্ষম হয়েছিল। তার দেহে যে প্রাণ নাই, সে–কথা বোঝার আগে। এখন যেটুকু সে দেখতে পায়, তা সে সংক্ষিপ্ত স্মৃতির জন্যেই। শাড়িটা অসংলগ্ন, পায়ের কাছে এক ঝলক চাঁদের আলো। একটি হাতই দেখা যায়। অন্য হাতটি কি দেহের তলে চাপা পড়েছে? মুখে ছায়া, শুধু ছায়া। আসলে মুখটা ঠিক মনে পড়ে না।

যুবক শিক্ষকের মনে ভয় বা ঘৃণা বা দুঃখ—কোনো ভাবই জাগে না। তবে কেন সে দৃশ্যটি স্মরণ করার চেষ্টা করছে? আজ যে–স্থানে সে এসে পৌঁচেছে, তারই অর্থ কি সে–পরিত্যক্ত প্রাণহীন দেহটির মধ্যে সন্ধান করছে? কাদের তার জন্যে যে–ভাবাবেগ বোধ করে নাই, সে–ভাবাবেগই কি সে নিজের মনে সৃষ্টি করতে চাইছে? সে জানে না কেন সে দৃশ্যটি স্মরণ করবার চেষ্টা করে।

হয়তো সে–দেহটি প্রাণ নেই বলে অর্থহীন নয়। বাঁশঝাড়ে যুবতী নারীর জীবন শেষ হলেও সে–দৃশ্য স্মরণ করে যুবক শিক্ষকের মনে কোনো ভাবের আভাসও না দেখা গেলেও, সেখানেই যুবতী নারীর কথা শেষ হয় নাই। কারণ, তার জন্যে এখনো কি কারো শাস্তি পাওয়া বাকি নাই?

কিন্তু কে শাস্তি পাবে? পুলিশ–কর্মচারীর সামনে বসে যুবক শিক্ষকের হয়তো এই ধারণা হয় যে, কে শাস্তি পাবে সেটি আর প্রধান কথা নয়। শাস্তিটার অর্থ যখন মৃত যুবতী নারীর কাছে আর পৌঁছবে না, তখন কে শাস্তি পাবে তাতে তার আর কী এসে যাবে? শাস্তিটা তার জন্যে নয়। যুবক শিক্ষক যদি ভুল করে শাস্তিটা নিজের ওপরেই টেনে আনে, যুবতী নারীর মৃত্যুর জন্যে সে–ই যদি অবশেষে শাস্তি পায়, তবে শাস্তিটা আসলে যার উদ্দেশ্যে সেখানে তা পৌঁছুবে। সে–কথায় সে কি একবার সান্ত্বনা পেতে পারে না?

কিন্তু যুবক শিক্ষক জানে না। যে–দৃশ্যে কোনোই মনোভাব জাগে না, সে–দৃশ্যই সে অর্থহীনভাবে দেখবার চেষ্টা করে।

তার ব্যঙ্গ যুবক শিক্ষকের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না দেখে পুলিশ–কর্মচারী এবার তার দিকে তাকায়, তারপর তার ঝানু চোখে ঈষৎ কৌতূহলের ভাব দেখা দেয়। যুবক শিক্ষক তারই দিকে নিষ্পলকদৃষ্টিতে চেয়ে পূর্ববৎ স্থির হয়ে বসে আছে, চোখে–মুখে কোনো উদ্ধত ভাব নাই। বরঞ্চ সমীহ–বিনয়ের ভাবই যেন তাতে। গায়ের জীর্ণ আলোয়ানটি ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অতিশয় জীর্ণ মনে হয়। আর মনে হয় কোনো কথায় তার কান নাই। কোনো কথার প্রয়োজন সে বোধ করে না।

BanglaBook.org

পুলিশ–কর্মচারীর চোখ একবার ক্রোধে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যুবক শিক্ষকের দৃষ্টির সামনে সে–ক্রোধ হয়তো অর্থহীন মনে হয় বলে সে নিজেকে সংযত করে। তারপর তার সরকারি ভ্রূকুটিও প্রত্যাবর্তন করে। সোজা হয়ে বসে কঠিন–দৃষ্টিতে তাকিয়ে যুবক শিক্ষককে প্রশ্ন করে, "আপনার আর কিছু বলবার নাই?"

যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না।

"শুনছেন?" সাব–ইন্সপেক্টর বলে। কনস্টেবলের বুটের আওয়াজ হয়।

সচকিতভাবে সজ্ঞান হয়ে যুবক শিক্ষক আবার তার বক্তব্যটি বলে। শুনে পুলিশ–কর্মচারীর মুখে তীব্র বিরক্তির ভাব জাগে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে কেবল। তারপর সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে। বাজে কথার সময় শেষ হয়েছে।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG